কত ব্যথা

তরুণকুমার ভাদুড়ী

করুণা প্রকাশনী
১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

বাবলুকে—

ভাইয়া—এই বইটা তোকেই দিলাম। তোর কথা আমি রাখতে পারিনি। ছোটদের জন্যে বই লেখার সময় আর আমার হোলো না। যখন হবে তখন আমি হয়ে যাব বুড়ো আর তুইও হয়তো ছোটো থাকবি না। এখন না পারিস বড় হয়েই না হয় এই বইটা পড়ে নিস্, কেমন?

—তোর ভাইয়া।

জীবনের চলার পথের কথা ভাবতে ভাবতে কতই না জানা অজানা মুখের কথা স্মৃতির মানসপটে ভেসে ওঠে। "কত ব্যথা"তে তাদেরই মধ্যে কয়েকজনকে ধরে রাখলাম।

"কত ব্যথা" প্রথম ১৯৬৪ সালের শারদীয় "ঘরোয়া" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। "করুণা প্রকাশনী"র শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে পরিমার্জিত আর বর্ধিত হয়ে এখন বই-এর আকার ধারণ করল।

শ্রীমুখোপাধ্যায় মাসের পর মাস পাণ্ডুলিপির জন্যে ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছে। আমার অলসতার কাছে শেষে তাকে হার মানতেই হয়েছে।

ই। ১৮৩। ৪ প্রফেসর কলোনী
ভোপাল (মধ্যপ্রদেশ)
১লা বৈশাখ, ১৩৭২
১৪. ৪. ৬৫

তরুণকুমার ভাদুড়ী

" ··We look before and after,
And pine for what is not :
Our sincerest laughter
With some pain is fraught ;
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought·· "

—**Shelley**

এক

এক এক করে সব সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। কেউ জানিয়েছে সমবেদনা, কেউ আন্তরিকতার সুরে করেছে দীর্ঘ জীবনের কামনা আর অনেকে আবার ভুল করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা দেখিয়েছে। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর চাকরি করার পর আমি তার পরের দিন অবসর নেব। কর্মবহুল জীবনের হবে পরিসমাপ্তি। খবরের কাগজের পুরোনো বাসি খবরের মতো আমিও হয়ে যাব আউট অব ডেট্। আর শুনতে পাব না রোটারী মেশিনের ঘড়ঘড় শব্দ, আর টেলিপ্রিন্টারের টিক্ টিক্ টিক্। প্রেসের কালো কালি আর লাগবে না আঙুলের ডগায় আর দৌড়তে হবে না খবরের পেছনে। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সাংবাদিক জীবনে অনেক দেখেছি অনেক শুনেছি আর শিখেছি কিছু। খবরের কাগজের পুরোনো ফাইলের মতো সবই আমার মনে নথি করা থাকবে। যারা সমবেদনা জানিয়েছে তারা হয়তো ভেবেছিল আমি শেষ হয়ে গেলাম, আর হয়তো আমার জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটবে না, কারণ উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে আমি আর জড়িত থাকব না, কারণ আমি আর সাংবাদিক থাকব না। যারা দীর্ঘ জীবনের কামনা করেছে তারা হয়তো বুঝতে পারে নি সাংবাদিক জীবন থেকে অবসর নেবার পর, আমার কাছে জীবনের আর কোনো মানেই থাকতে পারে না। সাংবাদিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই তো আমার জীবনও শেষ—সব সুখ

দুঃখ, ব্যথা, আনন্দ—সব শেষ। আমি ভুল করেছিলাম। সাংবাদিক জীবনের পরেও আমাকে বাঁচতে হয়েছে—আরো অনেককেও বাঁচতে হয়েছে আরো অনেক দুঃখ আরো অনেক ব্যথা দেখতে ও পেতে। কিন্তু সবচেয়ে ভুল করেছিল তারা যারা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা দেখিয়েছিল আমায়। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে আর সময়ই ছিল না। যেটুকু ছিল তা উজ্জ্বল হয়নি—হয়েছিল ম্লান, ধূসর, বিষাদময়।

সব শেষে গিয়েছিলাম টমলিনসন সাহেবের কাছে বিদায় নিতে। অনেক স্নেহ, অনেক প্রেরণা, অনেক উৎসাহ পেয়েছি সম্পাদক মিঃ টমলিন্সন সাহেবের কাছ থেকে। কাজে ফাঁকি দিতে পারি নি তার কড়া শাসনে তাই হয়তো হয়েছিলাম সফল ও কৃতী সাংবাদিক। পিটে, ঠুকে, বাজিয়ে তিনিই তৈরি করেছিলেন আমাকে তাই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে মনটা ভারী হয়ে উঠেছিল অনেকক্ষণ বসেছিলাম সামনে, কোনো কথাই হয়নি। এক সময় সিগারটা নিবিয়ে বলে উঠলেন, "সো ইউ আর গোয়িং টুমরো?" কৃতজ্ঞতার সুরে বললাম, "হ্যাঁ স্যার, কালই যাচ্ছি।"

তার পরেই টমলিন্সন সাহেব যে কথাটা বলে উঠেছিলেন তা শুনে শুধু অবাক্ই হইনি চমকেও উঠেছিলাম। হঠাৎ বাজ পড়লেও এত চমকে উঠতাম না। মানুষটা কি পাথর না দয়া মায়াহীন একটা মেশিন! মুখে কোনো ভাবান্তর না দেখিয়েই বললেন, "বাট্ ইউ আর অন ডিউটি টুডে?" আজ তো তুমি ডিউটিতে আছ?

বললাম, "ইয়েস স্যাব !"

ধীরে ধীরে ড্রয়ারটা খুলে একটা কাগজ বের করে আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দেন ডু দিস ফিচার বাই দিস ইভনিং।" আজ সন্ধ্যের মধ্যেই একটা লেখা দিতে হবে। শেষ দিনেও লোকটা রেহাই দেবে না। কোনো দিনই তাঁর কথার "না" জবাব দিই নি। চুপচাপ বললাম, "ইয়েস স্যার।" কাগজ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। চোখ বুলিয়ে নিলাম কাগজটার ওপব। ব্লাইণ্ড স্কুলের ওপর ফিচার লিখতে হবে। অন্ধ বিদ্যালয়ের ওপব লেখা চাই। "হিউম্যান স্টোরি।" তাই হবে। কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে টমলিন্‌সন সাহেবের ঋণ শোধ দেব। কাউকে কোনো কথা না বলেই বেরিয়ে এলাম। সাহেব হঠাৎ ডাকলেন আবার। বললেন, আমায় আর কষ্ট কবে অফিসে আসতে হবে না। কারুর হাত দিয়ে লেখাটা পাঠিয়ে দিলেই চলবে। "বেস্ট অব লাক্ ওল্ড ম্যান।"

চমকে উঠেছিলাম আবার। এতদিন বলতেন "মাই বয়।" কাল আমি রিটায়ার করব তাই হয়তো বললেন, "ওল্ড ম্যান।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার"—শুধু মুখ থেকে মাত্র এই দুটো কথাই বেরুলো।

*

ঘুরে ঘুরে সব দেখাচ্ছিলেন মৃণালবাবু। ব্লাইণ্ড স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান মৃণাল মুখার্জী। কিরকম অবস্থা থেকে এই স্কুলটিকে তিনি গড়ে তুলেছেন আজকের এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সব শোনাতে লাগলেন। বললেন, "আপনারা যদি কাগজে একটু লেখেন অনেক সাহায্য আমরা পাই। কি দুঃখময়, অন্ধকার যে এদের জীবন, এদের সঙ্গে না মিশলে কিছুতেই বুঝতে পারবেন না। এরা সহানুভূতি আর সমবেদনা নিয়ে বাঁচতে চায় না। এরা চায় মানুষের মতো বাঁচতে আর সবাইকার মতো। ভগবানের এই নিষ্ঠুর অভিশাপ এরা মাথা নীচু করে মেনে নিতে রাজী না।"

অবাক্ হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম মৃণালবাবুর কথা। "এই আমাদের ওয়ার্কশপ। এখানে এরা হাতের কাজ শেখে। আর ঐ শুনুন গান। অদ্ভুত সুন্দর গায় কয়েকটি ছেলেমেয়ে। কখনো অন্ধদের খেলাধুলো দেখেছেন। ভাবতে পারেন চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধরাও কানামাছি আর লুকোচুরি খেলতে পারে ?"

"সত্যিই আশ্চর্য মৃণালবাবু।"

"চলুন আপনাকে আরো অবাক্ করে দিই। জানেন আমরা খুব লাকি। আমাদের স্কুলের ছোটো একটা ডিসপেনসারী আছে। এই কিছুদিন হোলো আমরা একজন ডাক্তার পেয়েছি। তিনি একটা পয়সা নেন না কিন্তু যদি তাঁর সেবা-যত্ন দেখেন আপনি অবাক্ হয়ে যাবেন। চিকিৎসার কথা ছেড়ে দিন, কি করে এই সব অভাগা অন্ধ শিশুদের সুখী

করা যায়, সারাদিন তাঁর এই চিন্তা। গিয়ে দেখবেন হয়তো বাচ্চাদের সঙ্গে হয় ছুটোছুটি করছেন কিংবা গান বা আবৃত্তি করছেন। অদ্ভুত মানুষ আমাদের এই নতুন ডাক্তারটি।

"অদ্ভুত মানে। আমি তো ভাবতেই পারেনি কেউ তার জীবনটাকে এমনিভাবে অন্যের সেবায় বিলিয়ে দেবে।

"এই তো আমরা এসে গিয়েছি ডিসপেনসারীর কাছে। নিজের চোখেই দেখবেন এই অদ্ভুত মানুষটিকে।"

দূর থেকে শুনতে পেলাম, এক স্বরে ভেসে আসছে ছোটো ছোটো শিশুদের মিষ্টি আওয়াজ "ব্যাব্যা ব্ল্যাক শীপ, হ্যাভ ইউ এনী উল...।"

"বা সুন্দব।"

ডিসপেনসারীব দরজার কাছে প্রায় এসে পড়েছি হঠাৎ মৃণালবাবু বলে উঠলেন, "আসল কথাই তো আপনাকে বলা হয় নি। আমাদের এই নতুন ডাক্তারটিও অন্ধ। বলুন তো অন্ধ না হলে কি আর অন্ধদের দুঃখ বোঝা যায়।" মৃণালবাবু হঠাৎ হেসে উঠলেন।

মৃণালবাবুর হাসিটা আমার মনে হোলো যেন অনেক দূর, অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। দরজার সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। মন্ত্রার্পিতের মতো। হাত-পা যেন কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। শিশুদের সেই মিষ্টি গান হঠাৎ থেমে গেল।

"চলুন, ভিতরে চলুন" মৃণালবাবুর কথাটা বোধহয় আমি শুনতেই পেলাম না।

একটা অস্ফুট আর্তনাদের মতো আওয়াজ বেরুলো আমার গলা দিয়ে, "নীতাদি তুমি।"

ঘরের অন্য কোণ থেকে আরো একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনতে পেলাম, "কে ? কে আমার নাম ধরে ডাকল। কে ? কে ? উত্তর দিচ্ছেন না কেন ?..."

"নীতাদি আমি।"

"তুই কোথা থেকে। কেই বা তোকে আমার খোঁজ দিল। কি করতে এসেছিস এখানে ?" কাঁপা কাঁপা গলায় নীতাদি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

মৃণালবাবু বোধহয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। "আরে, এতো আশ্চর্য ব্যাপার। কোথায় আপনাকেই অবাক্ করে দেব ভেবেছিলাম আর আপনিই আমাকে অবাক্ করে দিলেন। আপনি চেনেন নাকি এঁকে, কবে থেকে, কেমন করে ?" প্রশ্নগুলি করে গেলেন মৃণালবাবু।

"হ্যাঁ চিনি অনেকদিন থেকেই। অদ্ভুত সংযোগ তাই আজ অনেকদিন পরে এমনিভাবে আবার দেখা হয়ে গেল।"

"কিন্তু নীতা দেবী, আপনি না দেখেই এঁকে কি করে চিনতে পারলেন ?" মৃণালবাবু আবার প্রশ্ন করলেন।

"চোখে দেখতে পাই না বলে কি এত বছরের চেনা একজনের গলার স্বরও চিনতে পারব না মৃণালবাবু। একে কি আমি আজ থেকে জানি।" নীতাদি করুণ স্বরে জবাব দিল।

"যাও, তোমাদের আজ ছুটি" বলতেই একদল ছেলেমেয়ে

হৈচৈ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মৃণালবাবু আমি আর নীতাদিও চলে গেলাম স্কুলের অফিস ঘরে।

*

অবাক্ আমি হয়েছিলাম। এতদিন পরে এইভাবে নীতাদির সঙ্গে হঠাৎ আবার দেখা হবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। নীতাদি অন্ধ হয়েছে আমি জানতাম। আমার সামনেই তো অন্ধ হয়েছে। তারপর একদিন হঠাৎই কাউকে কিছু না বলেই হাসপাতাল থেকে চলে গিয়েছে। কোথায় যে চলে গিয়েছিল কেউই জানতে পারেনি। নীতাদি আমাকেও জানায়নি। দুঃখ হয়েছিল, রাগ হয়েছিল নীতাদির ওপর। তারপর কর্মবহুল জীবনে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। অনেকদিন অনেক বছর পরে আবার ফিরে এসেছি কলকাতায়। নীতাদির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তারপর বিচিত্র এই সংযোগ।

নীতাদির চেহারা খুব বেশী বদলায় নি। মাথার চুলে এপাশে ওপাশে কিছু পাক ধরেছে। মুখে তেমনি মিষ্টি হাসি। এককালে সুন্দর ভাসা-ভাসা টানা-টানা চোখ ছিল। কালো চশমার নীচে ঢাকা সে চোখ আর নেই।

"আমার হাতটা একটু ধরবি" কোয়ার্টারের দিকে এগোতে এগোতে নীতাদি বলেছে। খুব আস্তে নিজের একটা হাত দিয়ে আমার হাতটা ধরেছে। ধীরে ধীরে দুজনে কথা বলতে বলতে

চলেছি। "অনেকদিন হয়ে গেল নারে। কেমন দেখছিস আমাকে ? খুব বুড়ী হয়ে গিয়েছি না ?"

"হ্যাঁ, তা অনেকদিন হোলো বই কি। সেই যে তুমি হঠাৎ কাউকে কোনো কিছু না বলে পালিয়ে গেলে, তারপর তো এক যুগ চলে গিয়েছে ; না, খুব বেশী বুড়ী হওনি তবে মাথার চুল কিছু পেকেছে। তা চুল তো আমারও পেকেছে।"

"তাই নাকি ? দেখি ?"

"কি দেখবে !"

"না, দেখব না। দেখতে আর কোথায় পাই। তবু তোর মাথায় একটু হাত বোলালেই বুঝতে পারব।"

বেশ বুঝছিলাম 'দেখি' বলে নিজের ভুল বুঝে নীতাদি ব্যাপারটা সামলে নেবার চেষ্টা করছিল। আস্তে আস্তে হাতটা আমার মাথায় রেখে কয়েকবার বুলিয়ে নিয়ে বললে, "যাঃ, তোর আর কটা চুল পেকেছে"। আর কিছু বললাম না। হাত দিয়ে মানুষ যে কি করে কাঁচা আর পাকা চুলের প্রভেদ বুঝতে পারে আমি জানতাম না। ব্যাপার হয়তো এখানেই শেষ হয়ে যেতো কিন্তু নীতাদি আবার একটা এমন সমস্যার মধ্যে ফেলল যে আমার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার নিজেই সে আঘাত পেল। "আমার চুলে হাত দিয়ে দেখ, আমার কত চুল পেকে গিয়েছে" বলে নীতাদি আমার হাতটা প্রায় নিজের মাথার কাছে নিয়ে এল।

"হাত দিয়ে আর কি বুঝব আমি তো দেখতেই পাচ্ছি

তোমার কয়েকটা চুল পেকেছে”—কথাটা নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

“ও। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। তুই তো আর আমার মতো অন্ধ না। তুই তো চোখে দেখতেই পাস্। তোকে আবাব হাত দিয়ে কেন অনুভব কবতে হবে।”

“কেন ওসব কথা বলছ নীতাদি। থাক না ও সব কথা। আজ কতদিন পব তোমার সঙ্গে দেখা, চল একটু গল্পগুজব কবা যাক্।”

“না থাকবে কেন। এইটাই তো সবচেয়ে বড় সত্যি যে আমি অন্ধ, আমি চোখে দেখতে পাই না আর তুই চোখে দেখতে পাস্। যাকগে। সত্যিই তো আজ অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা।”

“আচ্ছা বল তো অমন কবে কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এলে কেন?”

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকল নীতাদি। তারপর বললে, “সত্যিই খুব অন্যায় হয়েছে, নারে? তোকে খবব না দেওয়া খুবই অকৃতজ্ঞের মতো কাজ হয়েছে।”

“না, তা বলছি না। হঠাৎ কিছু না বলে এই রকম ভাবে উধাও।”

“হ্যাঁ, তা হঠাৎই বলতে পারিস্। জানিস সেইদিনকার সেই ঘটনার পর আর বাঁচার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। আমার সব চেয়ে বড় শত্রু কারা জানিস। ঐ ডাক্তারগুলো। প্রাণপণ চেষ্টা করে আমাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়েই তুলল।

কিন্তু আবার অন্ধ হয়ে গেলাম। তারপর শুরু হোলো পুলিসের ঝামেলা। সে সব তো তুই জানিসই।"

"হ্যাঁ, সে সবই জানি। বেশ তো ভালো হয়ে উঠেছিলে। আমি মোটে মাস খানেকের জন্যে বাইরে গেলাম আর ফিরে এসেই শুনলাম তুমি নেই।"

"বড় একা একা লাগত। ভাবলাম এই জীবনের আর দাম কি। একবার ভেবেছিলাম দিই জীবনটা শেষ করে। ঘুমবার ওষুধটা পাশেই থাকত। কয়েকটা ট্যাবলেট বেশী খেয়ে ফেললেই সব শেষ হয়ে যেতো। একদিন তো রাতে উঠে প্রায় করেই ফেলেছিলাম কাজটা। ঠিক সেই সময়টাতেই রাতের নার্সটা রাউণ্ডে এসে সব মাটি করে দিল।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি। যেদিন শুনলাম পরদিন আমায় হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে সেইদিনই চুপচাপ রাতের অন্ধকারে হাসপাতাল ছেড়ে চলে এলাম। জীবনে প্রথম বুঝলাম অন্ধ হওয়া কাকে বলে। এতদিন হাসপাতালে ছিলাম তাই কিছুই বুঝতে পারিনি। কিন্তু বাইরে এসে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। অনেক কষ্টে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলাম। সেখানে কিছুদিন থেকে সোজা চলে গিয়েছিলাম জব্বলপুরে আমার দাদার কাছে। তারপরে কয়েক বছর যে কি করে কেটে গিয়েছে কে জানে। কত যে ঘুরেছি তার ইয়ত্তা নেই। এমন জায়গা নেই যে যেখানে যাই নি। গিয়েছি সব জায়গায়ই কিন্তু

দেখিনি কিছু। শুধু দিশাহীন নৌকোর মতো ভেসে বেড়াবার আনন্দ পেয়েছি।”

“তা হঠাৎ এখানে কি করে এলে ?”

“জানিস, তখন বোধহয় আমি দিল্লীতে আমার আর এক বন্ধুর বাড়ীতে। একদিন রাতে রেডিয়োতে শুনছিলাম কে যেন হেলেন কেলারের সম্বন্ধে কিছু বলছে। তারপর নিজেব মনের মধ্যে কেমন একটা সন্দেহ ক্রমাগত দোলা দিতে লাগল। ভাবলাম আমার জীবনটা না হয় নষ্ট হয়ে গেল। তাই বলে কি অন্যের কোনো কাজেও কি এই জীবনটা লাগবে না। পরের দিনই আবার কাউকে কিছু না বলেই চলে এলাম সেই চির পুরাতন কলকাতায়। জানিস্, ট্রামের সেই ঘড়ঘড়ানি, লোকের গোলমাল অনেকদিন পরে শুনতে বড় ভালো লাগল। তারপরই এই ব্লাইণ্ড স্কুলে। এখানে বেশ লাগছে। মনে হচ্ছে জীবনের বাকী কটা দিনও হয়তো ভালোই কেটে যাবে। আমি তো জীবনের অনেক কিছু দেখে তারপর অন্ধ হয়েছি কিন্তু যারা জন্ম থেকে পৃথিবীর এই আলো দেখতে পায়নি তাদের কথা একবার ভেবে দেখ দিকি ?”

“কিন্তু নীতাদি…”

আমার কথার মাঝেই নীতাদি বলে উঠল, “আমি জানি তুই. কি বলবি। থাক ওসব কথা। ওসব কথা মনে করিয়ে দিয়ে আর আমায় জ্বালাস না। কত ব্যথা আমায় পেতে হবে বলত !

“আচ্ছা থাক ওসব কথা বলব না”— নীতাদি বুঝতে

পেরেছিল আমি কি বলব তাই আমার বলার আগেই আমায় থামিয়ে দিয়েছিল। আর কথা বাড়াইনি।

কোন্‌দিকে যাবো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তাই চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আমার মনের ভাব নীতাদি বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল। বলে উঠল, "এবারে বাঁদিকে চল। একটা ল্যাম্প পোস্ট আছে খানিক দূরে তার সামনেই আমার ছোট্ট কোয়ার্টারটা। আমার হাতটা ভালো করে ধর, এই রাস্তাটা বড় খারাপ।"

সামনেই একটা বড় পাথর পড়েছিল। নীতাদিকে সাবধান করে বললাম, "একটু সামলে চল। সামনেই একটা পাথর রয়েছে।"

শুকনো হাসি হাসল নীতাদি, "পাথর। পাথরকে আমি আর ভয় করি না। আমি তো নিজেই পাথর হয়ে গিয়েছি। আমার দৃষ্টিও হয়েছে পাথরের মতো নিশ্চল স্থির। আর ওতো রাস্তার পড়া পাথর। আমার বুকের মধ্যে যে বিরাট পাথরটা নিয়ে আমি বেড়াচ্ছি তার কথা কি কেউ জানে? চল, চল চলা যাক্।"

সত্যিই নীতাদি বোধহয় আজ পাথরই হয়েছে। কোথায় সেই নীতাদি আর কোথায় এই নীতাদি। সব না বললেও আমি জানি তার এই বুকের পাথরের কথাটা। কোয়ার্টারের দিকে চলতে চলতে আমার চোখের সামনে আর একদিনের একটা দৃশ্য ভেসে উঠল।

দুই

ধীরে ধীরে বালিশের ওপর ভর দিয়ে উঠে মুখটা আমার কানের খুব কাছে এনে নীতাদি ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল,—"একবার ওকে খবর দিতে পারবি?"

বলেছিলাম, "চেষ্টা করে দেখবো নীতাদি।"

"না, চেষ্টা না। তুই যে করে পারিস একবার ওকে এখানে নিয়ে আয়। তোর অনেক আব্দারই তো আমি রেখেছি, আমার একটা কথা অন্তত রাখ।"

নীতাদি হাঁপাতে হাঁপাতে মিনতি করেছিল।

নীতাদির কথা আমি রেখেছিলাম আর সেই কথা রেখে কি ভুল যে আমি করেছিলাম, সে ভাবতে গেলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না। তিনটে মানুষের জীবনের সঙ্গে, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সঙ্গে কেন আর কবে যে কি করে জড়িয়ে পড়েছিলাম তা ভাবতে গেলে নিজেকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে। সে সব অনেকদিনের পুরোনো কথা, অনেক দিনই ভুলতে চেয়েছি আবার হয়তো ভুলেও গিয়েছি কিন্তু মাঝে মাঝে দুরন্ত ঝড়ের মতো এসেছে বরুণের অপ্রত্যাশিত চিঠি আর আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে সব কিছু। আমি ভুলতে চেয়েছি সব কিছু, কিন্তু বরুণ কিছুই ভুলতে চায়নি। ইচ্ছে করে সব কিছু সে মনে রেখেছে। পুরোনো ক্ষতের মতো সেই সব হারিয়ে যাওয়া দিনের স্মৃতি মনের মধ্যে পুরে রেখেছে আর তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে যন্ত্রণায় কাতরেছে। ইচ্ছে করে

সে নিজেকে ব্যথা দিয়েছে। সেই ব্যথাতেই তার ছিল অসীম আনন্দ। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে বরুণ হয়তো ম্যাসোচিস্ট। ম্যাসোচিস্ট বরুণ ছিল না। সে নিজেকে ধীরে ধীরে ম্যাসোচিস্ট তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। নিজেকে যন্ত্রণা দিতে সে ভালোবাসত। কিন্তু বরুণ বোধহয় কোন দিন ভাবতেই পারেনি যে সে আস্তে আস্তে একজন স্যাডিস্ট হয়ে উঠেছিল। চিঠি লিখে লিখে সে আমায় যন্ত্রণা দিত। সেই যন্ত্রণায় আমি যখন কাতরাতাম বরুণ বোধহয় তখন আনন্দ পেত।

পুরোনো দিনের অনেক কথাই জোর করে ভুলতে চেয়েছিলাম, হয়তো কিছু কিছু ভুলেও গিয়েছিলাম। কিন্তু অনেকদিন পরে আরেকদিন বরুণ আবার আমায় চরম যন্ত্রণা দিয়েছিল। আমার মনের মধ্যেও যে পুরোনো ক্ষতটা ছিল সেটা আবার দগদগে তাজা হয়ে উঠেছিল। সব ভুলে যাওয়া কথা আবার আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। বরুণের সব যন্ত্রণা একদিন হয়তো শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার! সুদূর সিমলা থেকে চিঠি এসেছিল বরুণের আবার। অনেক বড়, অনেক পাতার চিঠি।

"আর হয়তো বেশীদিন বাঁচব না। ডাক্তাররাও জবাব দিয়ে দিয়েছে। ডাক্তারদের বলেছিলাম একটা 'মার্সি কিলিং' করতে, কিন্তু অদ্ভুত মার্সিলেস জীব এই ডাক্তাররা। জানে আমাকে বাঁচাতে পারবে না তবুও ওষুধ খাওয়াবে, আর আমার যন্ত্রণাটা বাঁচিয়ে রাখবে। সব কটা স্যাডিস্ট।"

বরুণের চিঠি পেয়ে সব কথা আবার মনে পড়েছিল—বরুণ, নীতাদি, বব্, রতনবাবু, স্টুয়ার্ট সাহেব আরো অনেকের। তারপর আবার বরুণ চুপচাপ। কি জানি তার যন্ত্রণার শেষ হয়েছিল কিনা।

কিন্তু নীতাদিকে সেদিনের দেওয়া কথা রাখতে গিয়ে যে ভুল করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগও আমি পাইনি। সে সুযোগ কেউ আমায় দেয়নি।

জলভরা চোখে মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত করে আমার শার্টের কলারটা চেপে ধরে বব্ শুধু বলেছিল "ইউ ফুল"। আর বেশী কিছু সে বলতে পারেনি। হাসপাতাল থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার যাওয়ার দিকে তাকিয়েছিলাম। লম্বা করিডরের কঠিন ফ্লোরের উপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল সেই দ্রুত খট্‌খট্ শব্দ। ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে চলে যাচ্ছে বব্। একবারও পেছনে ফিরে তাকায়নি। আজও মাঝে মাঝে মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। কানে ভেসে আসে ববের ক্রাচের সেই এক-ঘেয়ে শব্দ খট্ খট্ খট। সারা হাসপাতালে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল সেই আওয়াজ।

কিন্তু বব্ কি সেদিন প্লেন ধরতে পেরেছিল? হয়তো পারেনি। হয়তো পেরেছিল। আমি জানি না। জানবার চেষ্টাও করিনি। বব্ আজ কোথায় আছে তাও আমি জানি না। আছে কি না তাও জানি না।

আর বরুণ? সেদিন হাসপাতাল থেকে সেও চলে

গিয়েছিল। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়েছিল নীতাদির দিকে, তারপরেই কেমন যেন পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল বরুণ। আমার শার্টের কলার চেপে ববের মতো "ইউ ফুল" বলেনি। কিন্তু হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার হাতটা জোরে চেপে ধরে কি একটা অব্যক্ত ব্যথায় গুমরে উঠেছিল বরুণ। তারপরেই ধীরে ধীরে করিডর দিয়ে চলে গিয়েছিল। খুব আস্তে আস্তে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ভিড়ের মধ্যে।

হাসপাতালে তখন শুরু হয়েছিল চিৎকার চেঁচামেচি হৈচৈ আর গোলমাল। ডাক্তার আর নার্সদের ছোটাছুটিতে হাসপাতালের শান্ত পরিবেশে যেন একটা ঝড় উঠেছিল।

বরুণ কোথায় চলে গিয়েছিল আমি জানতাম না। যখন এনকোয়ারী হয় তখন বব্ আর বরুণ কাউকেই পাওয়া যায় নি।

শুধু কয়েক মিনিটের জন্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল বব্ আর বরুণের। কোনো কটুতা, কোনো ঘৃণা, কোনো দ্বেষ ছিল না সেই দৃষ্টি বিনিময়ে। দুজনের চোখেই জল ভরে এসেছিল। ববের হাত যখন বরুণ চেপে ধরে, সে যেন বলতে চেয়েছিল, "ও-কে বব্—ইউ উইন, আই লুজ।" বরুণ হেরে গিয়েছিল ববের কাছে। তারই স্বীকারোক্তি করতে চেয়েছিল তার সেই চোখের দৃষ্টি সেদিন।

কিন্তু বব্ কি ক্ষমা করেছিল বরুণকে! কে জানে! আমি কিন্তু একটা কথা নিশ্চিতভাবে জানি—আমাকে কেউ ক্ষমা করেনি সেদিন—বব্, বরুণ কেউ না। নীতাদি কি ক্ষমা

করেছিল আমাকে। সে প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই। সে প্রশ্নের জবাব যখন পাবার চেষ্টা করেছিলাম তখন নীতাদির কাছ থেকে আমি অনেক দূরে সরে এসেছিলাম—অনেক দূরে। তারপর সেদিন যখন সেই প্রশ্নের জবাব পাবার বা চাইবার সুযোগ এসেছিল তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। সেই প্রশ্নের "হ্যাঁ" "না" কোনো জবাবেই আমার কোনো লাভ ক্ষতি হোতো না। তাছাড়া অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। নীতাদি তখন অন্য দুনিয়ার মানুষ। তাই নীতাদিকে সেদিন আর কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। জবাব না পেলেও কি জানি মনে কেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল নীতাদি হয়তো আমায় ক্ষমা করেছিল। কারণ নীতাদির কথা তো আমি রেখেছিলাম। সেই কথা রাখতে গিয়েই তো আমি বব্ আর বরুণের ক্ষমা হারিয়েছিলাম। "তুই যে করে পারিস, একবার ওকে এখানে নিয়ে আয়।" বলেছিল নীতাদি।

ছুটে গিয়েছিলাম দম্‌দম্ এয়ারপোর্টে। ব্যস্ত কোলাহলময়, বিদায় আর অভ্যর্থনায় মুখর লাউঞ্জের এক কোনায় বসেছিল বব্। অনেক বার, অনেকদিন বব্ আমায় জিজ্ঞাসা করেছে নীতাদির কথা। কিন্তু কোনোদিন বলিনি তাকে। প্রতিবারেই তাকে মিথ্যা বলেছি—"আমি জানি না।" বব্ শুধু ঐ জিজ্ঞাসাই করেছে "হোয়্যার এ্যাণ্ড হাউ ইজ শী?" কোথায় আছে নীতাদি আর কেমন আছে শুধু এই জানতে চেয়েছে। দেখা করবার কোনো আগ্রহ কোনো দিনই করেনি।

নীতাদির জীবন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল বব্ নিজেকে। অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি নীতাদির সঙ্গে সে কি দেখা করতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জোরে মাথা নাড়া দিয়ে তুহাত দিয়ে মুখটা চেপে ধরে প্রায় চিৎকার করেই বলত "মাই গড্ নো নো। ফর হেভেনস্ সেক্ নো। হাউ, হাউ ক্যান আই শো দিস, আগলী ফেস অ্যাণ্ড ডিফর্ম্ড ফিগার টু এনী ওয়ান?" কি করে তার সেই বীভৎস মুখ আর কদর্য চেহারা নিয়ে সে নীতাদির সামনে দাঁড়াবে এই ছিল তার ভাবনা। "সী উইল ডাই অব শক্।" আমায় দেখে শকেই মারা যাবে নীতা, রাতদিন এই বলত বব্।

মুখটা পুড়ে ঝলসে গিয়েছিল ববের। লাল টকটকে মুখের রং ঢেকে গিয়েছিল কালো কালো পোড়ার দাগে। সেই কালো পোড়া দাগের মধ্যে কয়েক জায়গায় উঁকি মারছে লাল টকটকে কয়েকটা রেখা আব মুখটা তাতে আরো বীভৎস হয়ে উঠেছিল। চোখের পাতাটা ঝলসে কয়েক জায়গায় কুঁচকে গিয়েছে। বাঁ-পাটা হাঁটুর থেকে কেটে বাদ দেওয়া। ডান হাতটা কনুই থেকে কাটা। ক্রাচে ভর দিয়ে চলত খট্ খট্ খট্ কবে আর ডান হাতের কোটের স্লিভটা ঝুলত কনুই-এর নীচ থেকে। কিন্তু সে সব কথা পরে।

আমায় দেখতে পায়নি বব্। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রেখেছিলাম ববের। দেখতে পেয়ে মৃত্যু হেসে উঠেছিল বব্। বব্ জানতো তাঁকে বিদায় জানাতে আমি আসবই। নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছে বব্। যেতে সে চায়নি

কিন্তু সেই না-চাওয়ার থেকেও আরেকটা প্রবল ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসেছিল। এদেশ থেকে নিজেকে ছিঁড়ে উপড়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা। সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত পুরোনো মধুর ঘটনা কতশত হাসি-কান্নার টুকরো টুকরো খুঁটিনাটি মুহূর্ত—সব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার একটা অসহনীয় ইচ্ছাই তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

"আই নিউ ইউ উইল কাম্।" বব্ অতি কষ্টে ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে উঠে বলল।

এক কোনায় টেনে নিয়ে গেলাম ববকে।

"বব।"

"ইয়েস।"

"নীতাদি একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। শী ওয়াণ্টস্ টু সী ইউ।" কোনো রকমে ঢোক গিলে গিলে বললাম কথাগুলো।

ফ্যালফ্যাল করে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল বব্ আমার দিকে। কোঁচকানো মুখটা আরেকটু বিকৃত হয়ে কুঁচকে উঠল। মুখে একটা বিরক্তি আর যন্ত্রণার সুস্পষ্ট ভাব। বিরক্তিটা আমার ওপর আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম। এতদিন আমি কেন তাকে বলিনি নীতাদি এখানেই আছে। কেন এতদিন তাকে সমানে মিথ্যা বলেছি। আর যন্ত্রণা-বোধ হয় তার নিজের কথা ভেবে আর বিদায়ের শেষ মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী আনন্দের আতিশয্যে।

"বাট মাই প্লেন লিভস ইন অ্যান আওয়ার্স টাইম।" এক

ঘণ্টার মধ্যেই তার প্লেন চলে যাবে। কোনো অন্য প্রশ্ন না করেই উত্তর দিয়েছিল বব্।

"প্লিজ বব্, কাম ফর টু মিনিটস্"। শুধু দু মিনিটের জন্যে আসতে মিনতি করেছিলাম বব্‌কে। আমি যে কথা দিয়েছিলাম নীতাদিকে। বব্‌কে আমায় নিয়ে যেতেই হবে তার কাছে। চুপচাপ লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে গাড়ীতে উঠে বসেছিল। এয়ারপোর্ট থেকে হাসপাতালের দীর্ঘ পথ কোনো কথাই বলেনি বব্। স্থাণুর মতো বসেছিল। সেই বিরক্তিকর নীরবতা তার নিজেরই হয়তো খারাপ লাগছিল তাই ক্রমাগত ঘন ঘন জোরে পাইপ টানছিল।

যখন হাসপাতালের কাছে এসে গাড়ী দাঁড় করলাম একটু হয়তো অবাক্ হয়েছিল বব্, কিন্তু কোনো প্রশ্ন সে আমায় করেনি। সব কিছুর জন্যেই বোধহয় বব্ তৈরি ছিল।

দীর্ঘ করিডোরের কঠিন ফ্লোরের ওপর ক্রাচটা খট্ খট্ খট্ করে এগিয়ে চলেছিল অপারেশন থিয়েটারের দিকে। দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল বরুণ। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ববের ক্রাচটা থেমে গিয়েছিল বরুণকে দেখে। শুকনো হেসে শুধু একটা "হ্যালো" বলে আবার এগিয়ে গিয়েছিল বব্ খট্ খট্ খট্ করে। তার পেছনেই ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলাম আমি আর বরুণ।

বরুণ সব কিছু জানতো। সে জানতো নীতাদি হাসপাতালে। কিন্তু নীতাদিকে সে কোনো দিনই জানতে দেয়নি যে সে সব কিছু জানে। কোনো দিন দেখা করতেও

চেষ্টা করেনি। হঠাৎ কয়েক দিনের জন্যে কোথায় যেন উধাও হয়ে যেত আবার হঠাৎই দমকা হাওয়ার মতোই এসে উপস্থিত হোতো। মাঝে মাঝে আবার দিনের পর দিন নিজের ঘর থেকেই বেরোতো না। দরজা জানলা বন্ধ করে মদে চুর হয়ে পড়ে থাকত। বিরাট জোরে রেডিয়োগ্রামটা খুলে দিয়ে "কা করু সজনী আয়ে না বালম" গান শুনত। সেই অবস্থাতেই কোনো কোনো দিন স্পীডে গাড়ী চালিয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতো।

কোনো কোনো দিন আবার ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হাসপাতালের সামনে এসে গাড়ী দাঁড় করাতো। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছি দেখি বরুণ চুপচাপ গাড়ীর মধ্যে মুখে পাইপ নিয়ে বসে আছে। "চল তোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি" বলে জোর করে গাড়ীতে তুলে নিয়ে আমায় বাড়ী পৌঁছে-দিয়েছে। পেছনের সীটের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করেছি তাজা অর্কিডের বোকে। শুধু একটা তাজা বোকে না। তার পাশে পড়ে থাকত আরো অনেকগুলো অর্কিডের বোকে। শুকনো মরা, অর্কিডের বোকে। ধীরে ধীরে জমে স্তূপ হয়েছে অর্কিডের। রোজ কিনেছে অর্কিডের বোকে কিন্তু কোনো দিনই যাকে দেবার জন্যে এনেছে তাকে দেয়নি বা দেওয়া হয়নি।

আমি কোনো প্রশ্ন করিনি বরুণকে। কিন্তু আমি জানতাম আর বরুণও জানতো যে আমি জানতাম কি ভালবাসত নীতাদি অর্কিড।

কিন্তু সেদিন লক্ষ করেছিলাম হাসপাতালে ঢোকার আগে

পেছনের সীট থেকে একটা তাজা বোকে তুলে নিয়েছিল বরুণ। অপারেশন থিয়েটারে ঢোকার সময়ও হাতে ছিল অর্কিডের বোকেটা। যাবার সময় ফেরত নিয়ে যায়নি বোকেটা। অপারেশন থিয়েটারেই রেখে গিয়েছিল আর যখন হাসপাতালে চরম গোলমাল শুরু হয়েছিল আর ডাক্তার আর নার্সরা ছোটাছুটি করছিল বোকেটা মাটিতে ছিটকে পড়েছিল। অনেকেরই পায়ের তলায় পড়ে অর্কিডগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। যখন স্ট্রেচার ট্রলীটা বের করা হচ্ছিল তার চাকায় জড়িয়ে গিয়েছিল কয়েকটা অর্কিড।

বব্ তখন বোধহয় চলেছে এয়ারপোর্টের দিকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্লেন চলে যাবে তার নিজের দেশে। বরুণ তখন কোথায় চলেছে কে জানে। হয়তো দরজা জানলা বন্ধ করে মদের বোতল খুলে শুনছে "যমুনা কে তীর"। নয়তো আবার হাওয়ার মতো গায়েব হয়ে গিয়েছে। আমি জানতাম না। তারপর আর অনেক দিন বরুণের কোনো খোঁজ পাইনি। আবার তেমনি হঠাৎই ডুম করে এসেছে তার চিঠি। তারপরই সিমলা থেকে এসেছে তার চিঠি, অনেক বড় অনেক পাতার চিঠি।

ব্যস্ত কর্মবহুল জীবনের ক্ষিপ্রগতিতে একদিন হয়তো সবই ভুলে যেতাম। অন্তত ভুলে যাবার চেষ্টা করেছি। নীতাদি, বব্, বরুণ, টাইমকীপার রতনবাবু, ম্যানেজার স্টুয়ার্ট সাহেব, মোতিরাম, সুকিয়াবাঈ, সবাইকেই একদিন ভুলে যেতাম। জীবনের সন্ধ্যায় একদিন বরুণের সিমলা থেকে চিঠি এসে সব

তছনছ করে দিয়েছিল। সব কিছু মনে করিয়ে দিয়েছিল আমাকে। সেদিন বরুণের চিঠি পড়েছি আর ছবির পর্দার মতো আমাব চোখের সামনেও সব ভেসে উঠেছে হারিয়ে যাওয়া দিনের স্মৃতিগুলো।

অর্কিড, মদের বোতল আর রেডিয়োগ্রাম নিয়ে বরুণ হয়তো সব ভুলতে বসেছে। হয়তো ধীরে ধীরে নিজেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি। যত সব আঘাত, বেদনা সব কি আমার জন্যেই তোলা ছিল। বরুণের সিমলা থেকে লেখা চিঠির পরে আর কোনো খবর পাইনি। আমিও চেষ্টা করিনি খোঁজ নিতে। তারপরে নিজের কাজে ডুবে থেকেছি অনেকদিন। অনেক কিছু মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছি। কিছু মুছেও ফেলেছিলাম। ঘুরে ঘিরে আবার এসেছি কলকাতায়। কাজ ছাড়া আর কিছুতেই নিজেকে ব্যস্ত করিনি। ধীরে ধীরে একদিন কাজের দিনও শেষ হয়ে এসেছে। তখন কি জানতাম কাজের জীবনের শেষ দিনের জন্যে তোলা রাখা ছিল চরম আঘাত। টমলিন্‌সন সাহেব তো ছিলেন নিমিত্ত মাত্র।

নীতাদির কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে আনমনাভাবে এই সব কথাই চিন্তা করেছি। কোনো দিন কি কখনও স্বপ্নেও ভেবেছিলাম এইভাবে সেদিন দেখা হবে নীতাদির সঙ্গে কলকাতারই বুকে অন্ধ বিদ্যালয়ে ?

তিন

"অনেক তো হিল্লী-দিল্লী ঘুরে বেড়াস। একবার চলে আয়না আমার কাছে। এই পাহাড়, এই জঙ্গল, এই সব বন্য মানুষ সব মিলিয়ে বোধহয় খুব খারাপ লাগবে না। শহর থেকে অনেক দূরের আমাদের এই বৈচিত্রহীন জীবন তোর কাছে হয়তো নতুনও লাগতে পারে। তোর তো আবার লেখবার বদ অভ্যাস আছে। কে জানে হয়তো লেখার মসলাও পেয়ে যেতে পারিস। চোখ-কান বুজে চলে আয়।

অনেকদিন পরে নীতাদির চিঠি একদিন হঠাৎ পেয়েছিলাম। নীতাদিকে আমি ভুলে যাইনি। ভেবেছিলাম নীতাদিই হয়তো আমাদের ভুলে গিয়েছিল। নয়তো হঠাৎ কাউকে না বলে, না জানিয়ে একদিন হুট্ করে কলকাতার মায়া কাটিয়ে সুদূর মধ্যপ্রদেশে কেন চলে যাবে। শুধু জানতাম নীতাদি কলকাতার ভাল চাকরি ছেড়ে মধ্যপ্রদেশের কোনো এক ম্যাঙ্গানিজ মাইন্‌স-এর হাসপাতালে চাকরি নিয়েছে। নিজের ঠিকানাও কাউকে জানায়নি।

একদিন অভিমানও বোধহয় হয়েছিল। কই কোনো কথা তো নীতাদি কোনো দিন আমার কাছে লুকোয়নি, তবে হঠাৎ আমাকেও না বলে এমনি করে চলে গেল কেন। নীতাদির কাছ থেকে অনেক স্নেহ, অনেক ভালবাসা আমি পেয়েছি। তাই বোধহয় অভিমানটাও বেশী হয়েছিল।

নীতাদির জীবনের ব্যর্থতার কথা আমি জানতাম—

কিন্তু সেই ব্যর্থতার বেদনা যে তাকে আমাদের কাছ থেকে এতদূর নিয়ে যাবে তা ভাবতে পারিনি। কে দায়ী সেই ব্যর্থতার জন্যে বরুণ না নীতাদি, তা বিচার করার অধিকার আমার হয়তো নেই। মাঝে মাঝে ভাবি হয়তো নীতাদি নিজেই দায়ী। কই বরুণ তো কোনোদিন নিজের মন থেকে নীতাদিকে সরিয়ে দেয়নি। হয়তো ভুল বোঝাবুঝি। জিজ্ঞেস করেছিলাম নীতাদিকে একদিন।

"ভুল বোঝাবুঝি? হয়তো হবে। কে জানে? কি আর হবে ওসব ভেবে?" শুকনো কাঁটা কাটা উত্তর দিয়েছিল নীতাদি।

বরুণও একদিন হঠাৎ চলে গিয়েছিল বিলেত। বরুণ জীবনে সাফল্য লাভ করতে চেয়েছিল। সাফল্যের মূলে সে ভাবত অর্থ, প্রচুর অর্থ। সে চেয়েছিল অর্থ উপার্জন করতে। অর্থ উপার্জনের নেশা লেগেছিল বরুণের। অর্থের প্রতি লোভ ছিল না বরুণের কিন্তু সে চেয়েছিল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রচুর উপার্জন করতে। শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখত বরুণ—বড় বড় ফ্যাক্টরী, মিল, কলকারখানা। প্রচুর অর্থ উপার্জনও করেছিল বরুণ। কিন্তু যখন প্রচুর অর্থ সে উপার্জন করল তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। জীবনটা তখন আরেকজনের কাছে হয়েছে অর্থহীন।

বরুণকে আনতে সেদিন আমিই গিয়েছিলাম এয়ারপোর্টে। প্রায় ছুটে নেমে এসেছিল গ্যাংওয়ে দিয়ে। "কেমন আছিস্" বলে জড়িয়ে ধরেছিল আমায়। তারপরই কেমন

যেন হয়ে গিয়েছিল বরুণ। অনেকক্ষণ ধরে কাকে যেন খুঁজছিল তার চোখ দুটো। কিন্তু কোনো কথাই জিজ্ঞেস করেনি তখন আমায়।

এয়ারপোর্ট থেকে শহরে আসার সময় গাড়ীতে আমিই বলেছিলাম। "নীতাদি এখানে নেই" কথাটা বলতে গিয়ে নিজেকে যেন অপরাধী মনে হচ্ছিল।

"তাই বুঝি। তাহলে কোথায়?"—নির্লিপ্তের মতো প্রশ্ন করেছিল বরুণ। মনে যে আঘাতটা পেয়েছে তা লুকোবার জন্যই বোধহয় এই রকম উত্তর দিয়েছিল।

"আমি জানি না কোথায়।"

"জানিস্ না?"

"না হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলেই নীতাদি কলকাতার চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে।"

"আই সী" আবার সেইরকম জবাব। যেন নীতাদি থাকা বা না থাকা বরুণের কাছে কোনো মানেই রাখে না। এটা যে কত বড় মিথ্যা সেটা বরুণও জানত, আমিও জানতাম।

তারপর যখন নীতাদির চিঠি এল তখন বরুণকে জানাতে পারলাম না নীতাদি কোথায় আছে। জানাবার কোনো উপায় ছিল না। কারণ তখন বরুণ কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছে কাউকে না জানিয়ে। কোথায় গিয়েছে তাই জানতাম না। যখন সিমলা থেকে বরুণের চিঠি এসেছে তখন নীতাদিকে আমি আবার হারিয়ে ফেলেছি। তারপর

অনেকদিন পরে দেখা হয়েছিল বরুণের সঙ্গে। নীতাদি তখন হাসপাতালে।

ছোট্ট ফিয়াট গাড়ীটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বরুণ রোজ মেডিক্যাল কলেজের সামনে। নীতাদিকে কিছু বলতে হোতো না। কলেজ থেকে বেরিয়ে সোজা এসে বসত গাড়ীতে। দুজনের পরীক্ষার ফল এক দিনেই বেরিয়েছিল। সেদিন বোধহয় একটু জোরেই গাড়ী চালিয়ে বরুণ পৌঁছেছিল ইউনিভার্সিটিতে। রেজাল্ট শীটের সামনের ভিড় ঠেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এসেছিল নীতাদি। ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল আর উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল বরুণ। মাঝ পথে প্রায় ধাক্কা।

"বরুণ"—চিৎকার করে উঠেছিল নীতাদি আনন্দের আতিশয্যে।

"নীতা"—স্থান, কাল পাত্র সব ভুলে গিয়ে বরুণ নীতাদির হাতটা চেপে ধরেছিল।

"বরুণ আমি—।"

"নীতা আমি—।"

"পাস করেছি"—দুজনের মুখ দিয়ে একসঙ্গেই কথাটা বেরিয়েছিল আর দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়েছিল।

নিউ মার্কেট থেকে অর্কিডের বোকে কিনে বরুণ দিয়েছিল নীতাদিকে।

"কি সুন্দর"—বলেছিল নীতাদি।

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পাল-ছেঁড়া একটা নৌকোর মতো

দু'জনে সেদিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছিল অনেক রাত পর্যন্ত। অনেক রঙীন ফানুস উড়িয়েছিল দুজনে। অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে ভবিষ্যতের রঙ মাখানো জীবন নিয়ে।

"তাই ভাল বরুণ"—নীতাদি বলে উঠেছিল।

"কি ভাল ?" বরুণ আনমনাভাবে প্রশ্ন করেছিল।

"চলো এখান থেকে আমরা চলে যাই কোনো একটা ছোটো শহরে। তুমি কৃতি ইঞ্জিনিয়ার আর আমি ডাক্তার। দুজনেই কাজ করব। কেমন ? আমার ভাবতেও কেমন সুন্দর লাগছে।

"না নীতা, তা হয় না।"

"কি তা হয় না"—আহতের সুরে নীতাদি বলেছিল।

"না নীতা, আমি চাকরি করব না।"

"চাকরি করবে না তো কি ঘাস কাটবে ?" খিলখিল করে হেসে উঠেছিল নীতাদি।

"হেসো না নীতা। আমার আদর্শ আরো অনেক বড়, অনেক উঁচু।"

"কত বড় ? কুতুবমিনারের মতো। দেখো পড়ে যাবার ভয় আছে—" ঠাট্টা করবার লোভ সামলাতে পারছিল না নীতাদি।

"সত্যি বলছি নীতা, চাকরি আমি করব না। নিজের হাতে গড়ে তুলব বিরাট বড় ফ্যাক্টরী। হাজার হাজার লোক কাজ করবে ফ্যাক্টরীতে। ভাবতে পার তুমি, রাতদিন মেশিন চলবে, নতুন নতুন জিনিস তৈরি হবে।"—এক নাগাড়ে কথা-গুলো বলে গেল বরুণ, যেন স্বপ্ন দেখছে।

"কিন্তু হাজার হাজার টাকা কোথা থেকে আসবে। গৌরী সেন দেবে নাকি?" নীতাদি জিজ্ঞেস করে।

"কেন বাবার কাছ থেকে নেব টাকা।" জোর দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেছিল বরুণ। এর পরে আর কিছু বলেনি নীতাদি।

পরের দিন বিকেলেই বরুণ আবার এসে দাঁড়িয়েছিল নীতাদির সামনে। সব আত্মবিশ্বাস, সব আত্মপ্রত্যয়, সব স্বপ্ন যেন তার ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। নীতাদিই আমাকে বলেছিল সব কথা। রাতে বাড়ী ফিরে গিয়েই বরুণ বাবাকে প্রণাম করে জানিয়েছিল তার পাসের খবর। শুকনো আশীর্বাদ করে বরুণের বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "পাস তো না হয় করলে। এবার কি করবে? কোথাও চেষ্টা-চরিত্র করছ চাকরি-বাকরির জন্যে?"

"না বাবা চাকরি আমি করব না।"

"চাকরি করবে না তো কি করবে। বাবার হোটেলে আর কতদিন চালাবে?"

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল বরুণ। এরকম আকস্মিক আঘাতের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। আমতা-আমতা করে বলেছিল, "আমি ভাবছি নিজে একটা ফ্যাক্টরী করব। আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে আর কোনো প্রবলেমই আমার নেই।"

"তোমার খামখেয়ালী চরিতার্থ করার জন্যে আমার টাকা নেই। নিজে অর্থ উপার্জন করে তারপরে ও-সব সখ মিটিও।"

"আচ্ছা তাই চেষ্টা করব"—বলে বরুণ বেরিয়ে এসেছিল। পেছনথেকে বাবার রাসভারী গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল, "হ্যাঁ, তাই কোরো।"

অভিমানে দু চোখে জল উপচে পড়েছিল বরুণের।

"না নীতা এত বড় আঘাত আমি মেনে নেব না। আমি এই ব্যর্থতা কিছুতেই স্বীকার করব না।" বরুণ নীতাদিকে বলেছিল। নীতাদি তখনও কিছু বলেনি। নীতাদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন বাধা দেয়নি সে বরুণকে।

"কি লাভ হোতো বল? ওর তখন রাগে দুঃখে কোনো জ্ঞান ছিল না। আমি বাধা দিতে চাইনি। তবু বলেছিলাম, 'চেষ্টা করে দেখ যদি কিছু করতে পার।' "

"অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বরুণ বলেছিল তুমি, তুমিও তাই বলছ নীতা।"

"জানিস্ আমি কিছু বলার আগেই বলেছিল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখব। শুধু তাই না নীতা, সাফল্য লাভ করে তবে তোমার সামনে আসব।' "

তারপর কদিন বরুণ পাগলের মতো টাকার চেষ্টায় ঘুরেছে। এখানে ওখানে যেখানেই আশা পেয়েছে সেখানেই ছুটেছে। কোথা থেকে যেন কিছু টাকা যোগাড় করেছিল। একদিন সকালে দুম করে এসে বলেছিল, "নীতা, আজ রাতেই আমি যাচ্ছি।"

'সে কি, কোথায়?'—অবাক্ হয়ে গিয়েছিল নীতাদি।

"বিলেত।"

চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছিল নীতাদির। "তুমি চলে যাবে আর আমি? আমি কি করব বলতে পার বরুণ?"

"দেখ নীতা, তুমি আমায় চোখের জল দিয়ে বাঁধতে চেয়ো না। আমার সব আশা, আকাঙ্ক্ষা ভেঙে দিও না। আমি জীবনে সার্থক হতে চাই। তাতে যদি সাহায্য করতে না পারো, নাইবা করলে, কিন্তু দয়া করে আমায় বাধা দিও না।"

"বাধা তোমায় আমি দিচ্ছি না বরুণ। তুমি যাও। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব। তোমার পথ চেয়ে থাকব, শুধু এইটাই মনে রেখো।"

সেইদিন রাতেই চলে গিয়েছিল বরুণ। সে অনেক দিনের কথা। একটা চিঠি দিয়েছিল নীতাদিকে। লিখেছিল তার পথের খোঁজ সে পেয়েছে। তারপর অনেক চিঠি দিয়েছিল নীতাদি। কিন্তু বরুণের কাছ থেকে কোনো উত্তরই আসেনি। বরুণের তখন সময় ছিল না। অর্থ ছাড়া আর কোনো চিন্তাই তার ছিল না।

"আমায় চিঠি লেখার সময়ও যদি তোমার না থাকে তাহ'লে দয়া করে আমায় তাই জানিয়ে দিও। তোমায় আর বিরক্ত করব না। শুধু তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।" শেষ চিঠিতে লিখেছিল নীতাদি।

এই চিঠির উত্তর বরুণ দিয়েছিল। অনেক ভালো হোতো যদি চিঠিটার উত্তর সে না দিত। তার চিঠি ভেঙে দিয়েছিল নীতাদির বুক। এত বড় আঘাত, এত বড় অপমান যে বরুণ করতে পারে নীতাদি স্বপ্নেও ভাবেনি। সারা রাত,

বালিশের ওপর মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল নীতাদি।

বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম নীতাদিকে "নীতাদি, তুমি ভুল বুঝেছ। বরুণ তোমাকে আঘাত নিশ্চয়ই দিতে চায়নি। সে শুধু এই বলতে চেয়েছে যে সে শুধু কাজের মধ্যেই ডুবে আছে আর তার স্বপ্ন সাকার না হওয়া পর্যন্ত সে কোনো অন্য চিন্তাই মনে আনতে পারে না।"

"তুই কি আমাকে ছেলেমানুষ ভেবেছিস না কি যে আমায় ভোলাতে চেষ্টা করছিস্।"

"না, তা না। তোমার বোঝারও ভুল হতে পারে তো ?"

"কোনো ভুলের প্রশ্ন নেই এর মধ্যে। এই চিঠির অন্য কি মানে হতে পারে তুইই বল।"—বলে চিঠিটা ছুঁড়ে দিয়েছিল নীতাদি আমার দিকে।

ছোট্ট চিঠি। "নীতা—আমার এখন স্বপ্ন দেখার সময় নেই। তোমার সময় আছে তুমি দেখতে পার। আমি এখন কোনো কথাই ভাবতে পারি না। কোনো ভাবপ্রবণতার বিলাসের আমার সময় নেই। আমি সার্থক না হওয়া পর্যন্ত দেশে ফিরব না। যখন ফিরব তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। হয়তো আমি মানুষই থাকব না। একটা মেশিন হয়ে দাঁড়াব ততদিনে। ততদিন কি অপেক্ষা করতে পারবে আমার জন্যে ?"—অনেকক্ষণ চিঠিটা নিয়ে চুপচাপ বসেছিলাম।

"কি, কোনো অন্য মানে খুঁজে পেলি ?" নীতাদিই সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেছিল।

কোনো উত্তর দিতে পারিনি নীতাদিকে। কিন্তু কি জানি কেন যেন আমার মনে হচ্ছিল বরুণ হয়তো নীতাদিকে আঘাত দিতে চায়নি। হয়তো বা কোথায় একটা ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে এর মধ্যে। তারপর আর নীতাদির সঙ্গে বরুণের সম্বন্ধে আর কোনো কথাই হয়নি। গতানুগতিকভাবে চলেছে জীবনযাত্রা আমার, নীতাদির আর সবাইকার। হয়তো বরুণেরও।

হঠাৎই এসেছিল বরুণের কেবল্ লণ্ডন থেকে। তার দিন দশ পরেই সে ফিরছে। ছুটে গিয়েছি নীতাদিকে খববটা জানাতে। যখন নীতাদির বাড়ী পৌঁছেছি তখন নীতাদি তার এক রুগী নিয়ে ব্যস্ত।

"নীতাদি"—প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছি।

"কিরে কি হোলো, অত হাঁপাচ্ছিস কেন?" রুগীকে পরীক্ষা করতে করতেই নীতাদি জবাব দিয়েছিল।

"নীতাদি, কেবল্ এসেছে।"

"কার?"

"বরুণের।"

"ও! কি ব্যাপার, সব ভাল তো?"

"নীতাদি, বরুণ দিন দশ পরেই আসছে।"

"তা নাচতে হবে না কি?"– শ্লেষ দিয়ে কথাটা বললে নীতাদি।

হঠাৎই রেগে উঠেছিলাম, "তুমি কি মানুষ না। এতদিন পরে বরুণ ফিরছে আর তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন তোমার মনে কিছুই হচ্ছে না।"

"আমার মনে আবার কি হবে।"

"বরুণ না হয় আমার বন্ধু। কিন্তু তোমার…"

"আমার আবার কি?" বেশ চিৎকার করে উঠেছিল নীতাদি। "কিসের সম্পর্ক আমার সঙ্গে তার। তোর যদি খুব আনন্দ হয়ে থাকে তার দেশে ফিরবার খবর পেয়ে তা হোক্। কিন্তু তাতে আমার কি?" বলেই ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছিল নীতাদি।

রাগে, লজ্জায়, অভিমানে তখনই চলে এসেছিলাম নীতাদির বাড়ী থেকে। তারপর কয়েকদিন আর যাইনি নীতাদির কাছে। যেদিন বরুণ ফিরবে তার আগের দিন আবার গিয়েছিলাম নীতাদির বাড়ী। শুধু জিজ্ঞেস করতে সকালে আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে যাবে কিনা। কিন্তু গিয়ে আর নীতাদির সঙ্গে দেখা হয়নি। শুধু এইটুকু জানতে পারলাম নীতাদি হঠাৎই কাউকে না জানিয়ে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে মধ্যপ্রদেশে অন্য আরেকটা চাকরি নিয়ে। কি চাকরি কোথায় চাকরি কেউ জানে না।

তবে কি বরুণকে এড়াবার জন্যই নীতাদি চলে গিয়েছিল? কিন্তু বরুণ তো এয়ারপোর্টে নীতাদিকেই খুঁজছিল চারিদিকে চেয়ে। কি জানি সবই হয়তো আমার ভুল ধারণা। তার অনেকদিন পরে পেলাম নীতাদির চিঠি।

চার

নাগপুর ছাড়িয়ে আরো আনক দূরে "দি ব্রিটিশ ম্যাঙ্গানীজ" কোম্পানির সব মাইন্‌স। আশেপাশে আরো কত কোম্পানির কত সব মাইন্‌স—মনসর, কান্দ্রি, ডোঙ্গরীবুজুর্গ, তিড়োড়ী, বালাঘাট, ছিন্দয়োরা, উকুয়া, ভাণ্ডারা, পারাসিয়া—কতশত ম্যাঙ্গানীজ আর কয়লার খনি। নাগপুর থেকে লোকাল ট্রেনে চেপে রামটেক স্টেশনে নেমে তারপর জীপে করে গিয়ে আরো অনেক দূরে ব্রিটিশ ম্যাঙ্গানীজ কোম্পানির মাইন্‌স। আশে পাশে ছোটো বড় সব কোয়ার্টার আর কুলী-মজুরদের বসতি। লাল ধুলো ওড়া আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে চোখে পড়ে কোম্পানির নিজস্ব হাসপাতাল। খুব বড় না কিন্তু সুন্দর, সুসজ্জিত।

ভোর সাতটা না বাজতেই বিকট জোরে ভেঁপু বেজে ওঠে আর পিলপিল করে কুলী-মজুররা ছোটে ডিউটি দিতে। প্রত্যেকের হাতে দুপুরের খাবার ময়লা ন্যাকড়াতে বাঁধা। গান করতে করতে, হাসতে হাসতে যাবে আর ধুঁকতে ধুকতে সবাই ফিরে আসবে বিকেলে ছুটির ভেঁপু বাজার সঙ্গে সঙ্গে। মাঝপথে তাড়িখানা হয় গুলজার।

ভোর বেলাতেই গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম নীতাদির সঙ্গে মাইন্‌স-এর কাছে। সামনেই উঠেছে বিরাট পাহাড়। থাক্ থাক্ করে কাটা হয়েছে পাহাড়ের গা। সকালের রোদে চিক্‌চিক্ করছিল সদ্য কাটা রক্‌সগুলো—সাদা

আর কালো সব রক্‌স। ট্রলি ট্রাক দিয়ে নেমে যায় মজুররা নীচে। জায়গায় জায়গায় মাচা বাঁধা। ছেনি আর হাতুড়ীর ঘায়ে সব সময় ভাঙে না কঠিন পাহাড়ের দেওয়াল। তখন করতে হয় ব্লাস্‌টিং। দুদিকে লাল নিশান উড়িয়ে সাবধান করে দেওয়া হয় সবাইকে। তীক্ষ্ণ হুইসিল বেজে ওঠে আর খানিক পরেই বিরাট জোরে ডিনামাইট ফেটে যায়। দূর দূর পর্যন্ত বিরাট বিরাট চাঁই রক্‌স ছড়িয়ে পড়ে। সেগুলো কুড়িয়ে চড়িয়ে দেওয়া হয় ট্রলিতে। স্টীম ইঞ্জিন গর্জে ওঠে আর শক্ত কেব্‌ল্‌স্‌গুলোতে টান পড়ে। ঘড়ঘড় করে ট্রলিগুলো ওপরে চলে যায় আবার নীচে নেমে আসে। একঘেয়ে সেই শব্দ—হাতুড়ী পিটিয়ে পিটিয়ে রক্‌সগুলো ছোটো করে ভাঙা হচ্ছে, ট্রলিগুলো ক্রমাগত উঠছে আর নামছে। ছোটো ছোটো টুকরোগুলো আবার ঝুড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে কুলী-মজুরদের দল আর ঢালছে ট্রলির মধ্যে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল আর ট্রলি আবার চলল ওপরে।

আরো ওপরে দেখা যাবে খুব ছোটো ছোটো 'বোল্ডার-ওর' জলে ধুয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে 'জিগস্‌'-এর মধ্যে রেখে। বোল্ডার-ওর আর বেড-ওর-এর ট্রলি জুড়ে দেওয়া হয় খেলনার মতো লিলিপুট ইঞ্জিনের সঙ্গে। হুস্‌ হুস্‌ করে ইঞ্জিন আঁকা-বাঁকা লাইনের ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে গিয়ে শেষে দাঁড়ায় সাইডিং-এ। আন্‌লোড্‌ করে পাহাড়ের মতো উঁচু স্ট্যাক তৈরি হোলো। আবার তোলা হোলো বিরাট

বিরাট খোলা ওয়াগানে। মালগাড়ী তখন চলল বম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতা, ভিজাগাপট্টম। সেখান থেকে জাহাজে করে চলে যাবে দেশদেশান্তরে ম্যাঙ্গানীজ-ওর আর নিয়ে আসবে ফবেন এক্সচেঞ্জ। তাই ম্যাঙ্গানীজকে নাম দেওয়া হয়েছে কালো সোনা—ব্ল্যাক গোল্ড।

তন্ময় হয়ে দেখছিলাম কালো সোনার খেলা। বেশ লাগছিল। নীতাদির কথায় সংবিৎ ফিবে পেলাম। "তুই তাহ'লে খানিকটা ঘুবে ঘুবে দেখ। আমি একটু হাসপাতালে যাই। বতনবাবুই তোকে সব দেখিয়ে, বুঝিয়ে দেবে।"

"রতনবাবু! এই রতনবাবুটি আবার কোন্ রত্ন?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"আজ্ঞে, এই অধীনকেই রতনবাবু বলে জানবেন" পাশ ফিবে যে ভদ্রলোকটিকে দেখলাম তিনিই কোম্পানির স্বনামধন্য রতনবাবু।– টাইম-কীপাব।

"ইনি এখানকার বহু পুরোনো লোক। সব কিছু জানেন। সবাই খুব ভালবাসে এঁকে।" নীতাদি পরিচয় করিয়ে দিয়েই চলে গেল হাসপাতালেব দিকে। খোঁচা খোঁচা সাদা-কালো দাড়ী-গোঁফ, গলাবন্ধ কোট আর খাঁকির ঢলঢলে প্যান্ট। চোখে নিকেলের পুরু চশমা। বাঁ বগলে শতচ্ছিন্ন ছাতা আর ডান বগলে পুরু লাল খাতা। মাথায় আবার সোলার টুপি। চেহারা দেখে বতনবাবুর বয়স বোঝা মুশকিল, পঞ্চাশও হতে পারে আবার পঁচাত্তরও হতে পারে।

"আজ্ঞে, ভালবাসবে না কেন বলুন। সবাইকার হাজরীর

হিসেব তো এই শর্মার কাছে। কোম্পানির কাছ থেকে মাইনে পাবে কি করে যদি আমি হপ্তায় হপ্তায় হাজরী না লাগাই। যত সব ছোটোলোক মশাই। কাজে কামাই করবে আর অ্যাবসেন্ট্ মার্ক করে মাইনে কাটলেই কেঁদে ককিযে বলবে 'সাব, কেয়া খায়ে গা'।" এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে গেলেন টাইম-কীপার রতনবাবু।

"ঠিকই তো খাবে কি তাহলে?" রতনবাবুকে রাগাতে ইচ্ছে হোলো হঠাৎ।

"কেন পাশেই তো রয়েছে তাড়িখানা। মরুক না তাই খেয়ে। ওদেরও প্রাণ জুড়োয় আর আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।"

হেসে উঠলাম রতনবাবুর কথা শুনে।

"আপনি তো হাসবেনই মশাই। আমার মতো এক নাগাড়ে পঞ্চাশ বছর ম্যাঙ্গানীজ মাইন্‌স-এ চাকরি তো করতে হয়নি। যদি করতেন তাহ'লে হাসির বদলে কান্না বেবোত বুঝলেন!"

"তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনি এতদিন চাকরি করছেন এখানে?"

"আমি কি আজকের লোক মশাই? আমার বয়েসের কি আর ট্রী-স্টোন, মানে গাছ-পাথর আছে। ঐ যে দেখছেন, ঐ দূরে ট্রলির কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। ঐ হোলো এখানকার বাবুরাও। ব্যাটা হাড় বদমাইস। ব্যাটা মাসে দশ দিন কামাই করবে আর মাইনের সময় হাতজোড় করে এসে বলবে, 'সাহেব, পগার পাইজে'।"

"সে আবার কি?"

"এখানকার ভাষা, মানে সাহেব মাইনে চাই। বাড়ীতে একপাল ছেলেমেয়ে। ব্যাটা তাড়ি খেয়ে অসুখে পড়ে থাকবে আর ছেলে-মেয়ে বউ কেঁদে কেঁদে মরবে। আপনিই বলুন মশাই, দেখা যায় সে সব।"

"তা তো নিশ্চয়ই।"

"তাতো নিশ্চয়ই। আপনিও দেখছি আমাদের ডাক্তার দিদির মতোই একেবারে দয়ার সাগর। এই মাসে কি হয়েছে জানেন। ঐ ব্যাটা বাবুরাও। ব্যাটা বারো দিন অ্যাব্‌সেণ্ট। বাড়ীতে সবাই ধুঁকছে না খেতে পেয়ে। তা মশাই আপনি ডিসহনেস্টই বলুন আর যাই বলুন আমি ব্যাটার হাজরী লাগিযে দিলাম। পরে ধরা পড়লাম। স্লেটর সাহেব তো বেগে আগুন। এই মারে তো সেই মারে বলে যখন কাজে যায়নি তখন কেন আমি ওর হাজরী লাগিয়ে ওকে মাইনে দিয়ে কোম্পানির টাকা নষ্ট করেছি। আমারও মশাই রাগ হোলো। হাজার হলেও বামুনের রাগ। ঝনাৎ করে পকেট থেকে নিজের মাইনের করকরে কয়েকটা নোট টেবিলে ফেলে বললাম, 'সাহেব, হিয়ার ইজ কোম্পানিজ মানি।' টাকাই তো নেবে ফাঁসি তো আর হবে না, কি বলুন ?"

হাসিটা বোধহয় খুব জোরেই হয়ে গিয়েছিল। রতনবাবু হঠাৎ চুপ করে গেলেন। তারপরে বোধহয় একটু রেগেই বলে উঠলেন, 'আপনি তো হাসবেনই।"

"না, মানে আপনি খুব স্ট্রিক্‌ট লোক কিনা তাই ভেবে একটু আনন্দিত হয়েছিলাম। সেই আনন্দেই একটু হেসে

উঠেছিলাম আর কি ? তা আপনি যখন রাগ করছেন তাহলে আর হাসব না।"

"এই দেখ। আপনি হাসবেন না তো কি আমি হাসব ? আনন্দে হাসবার মতোই তো আপনাদের বয়স। আমাদের কি হাসবার বয়স আছে। আর এই মাইন্‌স-এ কাজ করলে. সব হাসি শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায় বুঝলেন। হাসুন হাসুন, খুব হাসুন।" বলে রতনবাবু নিজেই উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। সে হাসি আর থামতেই চায় না।

"তাই যাই হোক আপনি কিন্তু বেশ স্ট্রিক্ট লোক।" রতনবাবুর হাসি থামাতে বললাম কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে।

"আপনি তো আর স্লেটর সাহেবকে জানেন না তাই বললেন ও কথা। ব্যাটা খাঁটি সাহেবের বাচ্চা। ষাঁড়ের ডালনা খেয়ে খেয়ে মনটাকে খুব শক্ত করে নিয়েছে। ব্যাটা আমার চেয়েও স্ট্রিক্ট। সন্ধ্যেবেলা নিজের পকেট থেকে আমার টাকাটা আমায় ফেরত দিয়ে বলে পাঠালো যে মাস্টার রোলে যেন বাবুরাংকে অ্যাবসেন্টই মার্ক করি।"

"কিন্তু কে এই স্লেটর সাহেব ?"

"এই দেখ। ও হরি আপনি জানেন না বুঝি। এই মাইন্‌স-এর বড় ইঞ্জিনিয়ার। এই তো সেদিন এসেছে বিলেত থেকে। কেন ডাক্তারদিদি আপনাকে বলেনি সাহেবের কথা ?"

"কই না তো। ডাক্তারদিদি কি করে বলবে সাহেবের কথা ?"

"এই দেখ। বারে ডাক্তারদিদি বলবে না তো কি রাম, শ্যাম, যদু, মধু বলবে? দুজনেই যে খুব বন্ধু। আর সত্যি কথা বলতে কি মশাই এই পোড়া জায়গায় দুটো তো মানুষ আছে মোটে—এক আমাদের ডাক্তারদিদি আর এক আমাদের স্লেটর্ সাহেব। বাকী সব কি আর মানুষ। বিরাট বিদ্বান লোক মশাই এই সাহেব। বিরাট বড়লোকের ছেলে, বিরাট টাকা। বিরাট খাটতে পারে। আর হ্যাঁ বিরাট হাসতে পারে। আর আপনিই বলুন না যে বিরাট হাসতে পারে সে ভালো লোক হবে না তো কি আমি আর আপনি ভালো লোক হব?"

"অ্যাঁ।"

"মানে সে ভালো লোক হবে না তো আমি ভালো লোক হব না ভালো লোক হবে ঐ ব্যাটা মাতাল বাবুরাও।" লজ্জায় প্রায় কাঁদ কাঁদ মুখ হয়ে এসেছিল রতনবাবুর।

"কি নাম বললেন সাহেবের। আলাপ করতে হবে তো" রতনবাবুকে হঠাৎ সেই বেফাঁস কথা বলে ফেলার লজ্জা থেকে বাঁচাবার জন্যেই বললাম।

"তা যান না ঐ সোজা বাঁদিকের ব্যারাকেই ওঁর অফিস। বাইরে বোর্ডেই লেখা আছে "বব্ স্লেটর।" ভালো নাম রবার্ট কিন্তু উনি বব্ই লেখেন-- বব্ স্লেটর। তা যাবেন তো চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না থাক। এখন তো আছি কিছুদিন। আলাপ করলেই হবে একদিন। চলুন আরেকটু ঘোরা যাক এদিক্ ওদিক্।"

"এই দেখ, দাঁড়িয়েই রয়েছি। আপনাকে সব ঘোরানোই বাকি রইল, চলুন চলুন।"

সেদিন রতনবাবুর সঙ্গে অনেক ঘুরেছি এদিক্ ওদিক্। রতনবাবু অনর্গল বলে গিয়েছেন। হঠাৎ এক সময় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা রতনবাবু, আপনি তো শুধু কালো সোনার গল্পই বললেন, কই নিজের গল্প তো কিছুই বললেন না।"

"এই দেখ, সময় আর কোথায় পেলাম। হ্যাঁ, তা মশাই গল্পই বলতে পারেন বৈ কি। সেই কবে পরীক্ষায় গাড্ডু মেরে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিলাম ঘুরতে ঘুরতে এখানে। কি জানি কেমন করে যেন সিম্‌সন সাহেবের সুনজরে পড়ে গিয়েছিলাম। সে কি আজকের কথা নাকি। তখন মশাই এসব এত মেশিন-টেশিন ছিল না। আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে গরুর গাড়ী আর মানুষের ঘাড়ে বস্তা বোঝাই হয়ে ম্যাঙ্গানীজ যেত বাইরে। সেই যে টাইম-কীপার হয়ে ঢুকলাম আজও টাইম-কীপারই রয়ে গেলাম। কত এল, কত গেল নিজের টাইমই মনে পড়ল না।"

"আচ্ছা রতনবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব কিছু মনে করবেন না তো"—আমতা-আমতা করে বলি।

"এই দেখ। মনে আবার কি করব। মনই নেই মশাই তার আবার মনে করব!" নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন টাইম-কীপার রতনবাবু।

"আপনি বিয়ে করেন নি?"

"এই দেখ। বিয়ে? আরে মশাই টাইম-কীপারি করতে

করতে টাইমই পেলাম না। আব যখন আমার টাইম হোলো যারা আমায় বিযে করবে তারা আমাকে বিয়ে কযাব জন্যে টাইমই দিতে পারল না।" আবার হেসে উঠলেন রতনবাবু।

যতবারই বতনবাবুকে তাঁব নিজের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছি ততবারই বতনবাবু রসিকতা কবে এড়িয়ে গিয়েছেন। তাই বেশী আর ঘাঁটাইনি তাঁকে। কিন্তু ম্যাঙ্গানীজ-এর গল্প বলতে তাঁর অদম্য উৎসাহ। সেদিন রতনবাবুব সঙ্গে ঘুবতে ঘুরতে অনেক গল্প শুনেছিলাম কালো সোনার। কবে কোথায় কি কবে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া গিয়েছিল সব জানতেন রতনবাবু। সেই যে কবে বোধহয় ১৭৭৬ সালে সুইডিশ্ কেমিস্ট গাহন্ সাহেব কেমন কবে প্রথম ম্যাঙ্গানীজ "আইসোলেট" করে-ছিলেন সব ইতিহাস রতনবাবুব জানা ছিল। রতনবাবুই বলেছিলেন প্রথমে নাকি আমরা জানতামই না ম্যাঙ্গানীজ কি। ভিজাগাপট্টমে রেললাইনেব নীচে "ব্যালাস্ট"-এর কাজ দিত ম্যাঙ্গানীজ। কেউ জানত না কি অমূল্য জিনিস নষ্ট করা হচ্ছে। সে তো এই ১৮৯১ সালের কথা। কোন্ এক সাহেব নাকি এসে বলেছিল, 'এ তোমরা করছ কি ? এত দামী জিনিস নষ্ট করছ? বাইরে রপ্তানী কর অনেক পয়সা পাবে।'

হ্যাঁ, তা কয়েকজন সাহেব মিলেই শুরু করেছিল ব্যবসা। সেই বছরেই প্রথম রপ্তানী করেছিল ৬৭৪ টন ম্যাঙ্গানীজ। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল বিরাট ব্যবসা আর ১৯২৬ সালে রপ্তানী হোলো প্রায় ১০ লক্ষ টন। মুঠো মুঠো টাকা আসতে

লাগল বিদেশ থেকে। তখন থেকেই তো নাম হোলো "ব্ল্যাক গোল্ড"—কালো সোনা।

কিন্তু এও বোধহয় সত্যি না। রতনবাবু জানতেন তারও আগে ১৮২৯ সালেই পাওয়া গিয়েছিল ম্যাঙ্গানীজ—নাগপুর থেকে বেশী দূরে নয় পেনচ্ নদীর কাছেই পারাসিউনীতে। এই নিয়েও নাকি আছে অনেক গল্প, অনেক সত্যি-মিথ্যে জড়ানো কিংবদন্তী। লাইম স্টোনের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল কালো সোনা। নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত চলে গিয়েছিল লাইম স্টোনের খাড়া "রক ব্যারিয়ার"। তার ওপর ছিল মোটে এক হাঁটু জল। হেঁটেই তার ওপর দিয়ে এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়া যেত।

গাঁয়ের লোকেরা ভাবল ভগবানের দয়া বোধ হয়। তাদের নদী পার হবার জন্যেই তিনি তৈরি করেছেন এই সেতু। তারা নাম দিল "ঘোগরা"। ঘটা করে পুজো করল জায়গায় জায়গায়। বছরে বছরে শুরু হোলো "ঘোগরা"র মেলা। কিন্তু লাইম স্টোনের সবটাই জলের নীচে থাকত না। একটা সাদা চকচকে লাইম স্টোনের চূড়া সব সময় থাকত জলের ওপর। গাঁয়ের মাতব্বরেরা বলল ঐ হোলো মহাদেব আর লম্বা লম্বা লাইম স্টোনের যে সারি সে হোলো নাকি মহাদেবের রথের চাকার দাগ আর যেখানে যেখানে রয়েছে ছোটো বড় গর্ত সে নাকি হোলো বলদের পায়ের ছাপ। কত শত সব কিংবদন্তী।

কিন্তু শুধু যে সাহেবরাই জানতো কালো সোনার দাম সে কথা রতনবাবু মানতে রাজী না। বললেন জব্বলপুরের আশে-

পাশের গাঁয়ের লোকেরা হাজার হাজার বছর থেকে ঐ কালো সোনা গলিয়ে তৈরি করত এক রকম ধাতু। তাকে তারা বলে "খেরী"। এই "খেরী" দিয়েই তৈরি হোতো হাতুড়ী, কাস্তে, কুড়ুল। হ্যাঁ, এটা কিন্তু মানতেই হবে সাহেবরাই প্রথম কালো সোনার ব্যবসা শুরু করে। অনেক সাহেবদেরই নাম মনে আছে রতনবাবুর। সেই কবে যেন ক্লার্ক ডড্ সাহেব এসেছিলেন নাগপুরের কাছেই ম্যাঙ্গানীজ খনি খুলতে। তারপর এসেছেন কগান সাহেব, কিলিক নিক্সন্, বার্ন কোম্পানি, কার্নেগী স্টিল কোম্পানি আর এসেছে—"দি ব্রিটিশ ম্যাঙ্গানীজ কোম্পানি" আর তাব সঙ্গে এসেছে—টাইম-কীপাব বতনবাবু- শ্রীযুক্ত রতনচন্দ্র ভট্টাচার্য পিতা বদনচন্দ্র ভট্টাচার্য —নিবাস? বলেন নি রতনবাবু।

"আচ্ছা রতনবাবু, আপনাদের দেশ কোথায়?"

"এই দেখ। আপনাদের দেশ কি? আমার দেশ। কবে কোন্ কালে ছোটো বয়েসে দেশ ছেড়ে বাউণ্ডুলে হয়েছি সে সব কি আর মনে আছে। মনে করতে চেষ্টা করলেই তো আবাব মনে কষ্ট পাব তাই আর মনেই করি না। বললাম তো মনটাই নেই, তাই আর মনে করার চেষ্টাই কবি না।" এই প্রথম রতনবাবু হাসলেন। মনে হোলো বোধহয় একটা ঢোঁক গিললেন।

"মাফ্ করবেন রতনবাবু, আপনার মনে কষ্ট দেবার আমার ইচ্ছে ছিল না। কথাটা হঠাৎই জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম।" খুবই অপ্রস্তুত হয়ে উঠলাম।

"এই দেখ। আমি আবার আপনাকে মাফ্ করব কি? আর মনে কষ্ট দেওয়া। আপনাকে তো বার বার বলেছি মন আমার নেই। যখন মনই নেই তাহলে আর কষ্ট দেবেন কি মশাই। ঐ যে সকালে দেখলেন সাদা সাদা চক্‌চকে রক্‌স আর বোল্ডার, আমার মন যদি থাকে তাহলে সেটা ঠিক ঐ বোল্ডার. আর রক্‌স-এর মতো শক্ত পাথর হয়ে গিয়েছে।" রতনবাবুর গলায় যেন কি একটা ওঠানামা করছে মনে হোলো।

পাঁচ

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যেবেলায় ফিরেছি নীতাদির কোয়ার্টারে। রতনবাবুর সঙ্গে গল্প তখনও শেষ হয়নি। যখন নীতাদির কোয়ার্টারের পথ ধরবার জন্যে বাঁদিকের রাস্তায় এসেছি তখন বাড়ীখানা বেশ মশগুল।

রতনবাবুই দেখিয়ে দিলেন, "ঐ দেখুন ব্যাটা বাবুরাও। কোনদিন শিক্ষা হবে না ব্যাটার।" গান হৈ-হল্লায়, সে এক এলাহী ব্যাপার। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। রতনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম,"ওরা কি গান গাইছে রতনবাবু ?"

নাকে রুমাল চেপে খানিকটা কাছে গিয়ে রতনবাবু ফিরে এসে বললেন ও আপনি শুনে কি করবেন। তাছাড়া মারাঠী ভাষা আপনি বুঝবেনও না।"

"তবু বলুন না শুনি" আগ্রহ করি।

রতনবাবু শোনালেন :

"মৌসীবাই মৌসীবাই
নৌরা ক্যাসা।
পেশোয়াচে টোপীওয়ালে
কারকুন জ্যাসা।"

"সে আবার কি ? মানেটা বলুন।"

রতনবাবু মানে করে দিলেন, "মাসীগো মাসী, তোমার কেমন বর চাই ? মাসী বলল "পেশোয়ার টুপি পরা কেরানীর মতো।"

"বা বেশ তো।"

"একটু হাসি তামাশা করেই বেটারা সারাদিনের দুঃখ ক্লান্তি ভুলতে চায়। ওসব গান-টানের কোনো মানেই হয় না। গাইলেই হোলো কিছু একটা আর কি?"

এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে পড়তে হোলো। কোথা থেকে যেন, করুণ সুরে বেহালা বাজছে। মনে হচ্ছে যেন দূর, অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে সেই করুণ রাগিণী।

"এই জঙ্গলের মধ্যে এত সুন্দর বেহালা কে বাজাচ্ছে রতনবাবু?"

"কে আবার, আমাদের বড় সাহেব। সন্ধ্যে হলেই সাহেব নিজের বেহালা নিয়ে বসবে। এই তো সামনেই তার বাড়ী। যাবেন নাকি? আপনার তো আলাপই হোলো না।"

"না থাক, হঠাৎ এখন গিয়ে ভদ্রলোককে বিব্রত করে লাভ কি? পরে আলাপ হবেই।"

"তা হবে। খানিকটা পরেই সাহেব নিজেই ডাক্তার দিদির বাড়ী যাবে."

"কেন, কি আছে নীতাদির বাড়ীতে?"

"থাকবে আবার কি। সাহেব তো রোজই যায়। সত্যি বলতে কি এই জঙ্গলের মধ্যে দুটোই তো শুধু মানুষ আছে, এক আমাদের ডাক্তারদিদি আর ঐ বড় সাহেব।"

কথা বলতে বলতে কখন যে নীতাদির কোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি বুঝতেই পারিনি। "কি বেড়ানো হোলো সব?" নীতাদির অভ্যর্থনায় চমক ভাঙল।

"দাদা বোধহয় খুব ক্লান্ত। আর ওঁদের কি আর এসব অভ্যেস আছে ?" রতনবাবু বলে উঠলেন।

আমি তখন ভাবছি কে এই বব্ সাহেব। কে এই বব্ সাহেব ?

"আয়, ভিতরে আয়। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি"—নীতাদির কথায় ঘরের মধ্যে ঢুকলাম।

আশ্চর্য এতদিনে নীতাদির কোনো পরিবর্তনই হয়নি। ঠিক তেমনই আছে। তেমনি মিষ্টি কথা আর হাসি। কিন্তু কেমন যেন একটা বেদনার ম্লান ছায়া মুখের ওপর পড়েছে।

"আচ্ছা নীতাদি, তুমি কাউকে না জানিয়ে না বলে হঠাৎ এমনি করে চলে এলে কেন বলত ?" ছোট্ট ড্রয়িং-রুমটায় বসতে বসতে নীতাদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"হঠাৎ আবার কি ? চলে এলাম আর কি ? কলকাতা আর ভালো লাগছিল না ?" নীতাদি জবাব দিল।

"কেন লুকচ্ছো আমার কাছে ? দূরে সরে গেলেই কি সব ভোলা যায় নীতাদি ?"

"না। তা হয়তো যায় না।"

"তবে। পালিয়ে বেড়ালেই কি তুমি ভেবেছ তুমি সব ভুলে যাবে ?"

"আবার কেন ওসব কথা তুলছিস। থাক না। এই তো বেশ আছি। এই কুলী-মজুরদের নিয়ে বেশ তো দিন কেটে যাচ্ছে। এরা আমায় ভালবাসে, আমি এদের ভালবাসি। এদের ভালবাসার মধ্যে না কোনো আদর্শের বালাই আছে না

আছে সাফল্যের উঁচু পাঁচিল। শুধু ভালবাসার জন্যেই এরা ভালবাসে। আমার তো কোনো অনুশোচনা বা দুঃখ নেই।"

"ভালো করে ভেবে দেখ তো তোমার কোনো দুঃখ বা অনুশোচনা আছে কি না?"

নীতাদির স্বরটা এবার কেমন যেন বেসুরো ঠেকলো। গলাটা একটু কেঁপে উঠল। তারপরেই বেশ জোরেই বললে নীতাদি—"দেখ, যদি তুই ওসব কথা বলতেই এখানে এসে থাকিস্ তাহলে তুই কালই চলে যা। ভাবলাম কোথায় তুই আসবি। ক'দিনের জন্যে একটু হৈ-হল্লা করা যাবে তা না সেই এক কথা। তোর আমি কি ক্ষতি করেছি যে তুইও আমায় এই রকমভাবে কাটা কাটা কথা শোনাবি? এত দূরে এসে অনেক কষ্টে মনের শান্তি ফিরে পেয়েছি তা তোর সহ্য হচ্ছে না, না? কেন তুই আমার সেই শান্তি নষ্ট করতে চাচ্ছিস্?" —নীতাদির চোখের কোনায় যেন একটু জল চিক্‌চিক্ করে উঠল।

"কিন্তু কি দোষ করেছিল বরুণ যে তাকে তুমি এত দূরে সরিয়ে ফেললে। কেন তার মনের শান্তি তুমি কেড়ে নিলে।" নিজের অজান্তেই বোধহয় একটু জোরেই কথা কটা বলে ফেলেছিলাম।

"তুই চুপ করবি!"—চিৎকার করে উঠেছিল নীতাদি।

কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। তা আর দেওয়া হোলো না। মুখ কাঁচুমাচু করে দরজার সামনে "বাঈসাহাব" বলে এসে দাঁড়িয়েছিল বাবুরাও-এর স্ত্রী সুকিয়াবাঈ।

অনর্গল মারাঠী ভাষায় যা সব বলে গেল তার মর্ম শুধু এই বুঝলাম যে বাবুরাও মদ খেয়ে বাড়ী ফিরে এসে যাতা কাণ্ড শুরু করেছে।

'নীতাদি বললে, "চল যাচ্ছি।"

জিজ্ঞেস করলাম, "তা তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে?"

"আমি ছাড়া কারুর কথা তো শুনবে না। তাই এরা আমার কাছেই আসে। তুই বস, আমি মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরে আসছি।" নীতাদি আর কোনো কথা না বলে সুকিয়াবাঈ-এর সঙ্গে চলে গেল। একা বসে রইলাম ঘরের মধ্যে। মাথার মধ্যে নানারকম এলোমেলো চিন্তা আর ভাবনার ভিড় জমা হোলো। ভাবতেই পারছিলাম না কি করে আর কোথায় নীতাদি তার হারিয়ে যাওয়া শান্তি আবার ফিরে পেল। আর শান্তি যে সে হারিয়েছিল তা তো সম্পূর্ণ নিজের দোষে। বরুণ এখন কোথায়? বরুণের মনে কি শান্তি আছে? তার মনে কি আর নীতাদির কোনো স্থান নেই। বরুণ কি সত্যিই মানুষ না হয়ে একটা মেশিন হয়ে ফিরেছে?

চিন্তা করতে করতে কয়েকটা বই নাড়াচাড়া করছিলাম। হঠাৎ একটা বই-এর মধ্যে থেকে একটা ফটো ঠক্ করে মাটিতে পড়ে গেল। হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ দেখার পরই বুঝতে পারলাম কার ফটো। বব্ স্লেটর। নীতাদির বই-এর মধ্যে বব্-এর ফটো। তাহলে কি? কেন রতনবাবুই তো বলেছিলেন নীতাদির খুব বন্ধু তাদের বব্ সাহেব। আরো

অনেকগুলো চিন্তা এসে জড়ো হোলো মাথার মধ্যে। বাইরে নীতাদির পায়ের আওয়াজ পেলাম। তাড়াতাড়ি বইটা উঠিয়ে রাখলাম।

"কি ব্যাপার, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে?"

"আর বলিস্ কেন। এতো রোজকার ঘটনা। এমন জ্বালায় এরা। গিয়ে দেখি ব্যাটা হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়েছে বাড়ীতে। ছেলেমেয়েগুলোকে বেদম মেরেছে। কান্নাকাটি, চেঁচামেচি, সে যাতা কাণ্ড। বউটাও হাউহাউ করে কাঁদছে। খুব ধমক দিয়ে এসেছি বাবুরাওটাকে।"

"কি লাভ হবে তাতে?"

"কদিন ঠিক থাকবে আর কি। আমাকে দেখেই ব্যাটা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আমার সামনে বেরোবার সাহস নেই। খালি ভিতর থেকে বলছে, 'বাঈসাহেব আর কখনো করব না। এবারের মতো মাফী দাও।' কি আর করি চলে এলাম। দুদিন পরে আবার এই হবে। আবার যাব, আবার ধমক দেব, আবার দুদিন ঠিক থাকবে। আর কি?"

বাইরে গাড়ীর আওয়াজ হোলো।

"আবার কে এল?" জিজ্ঞেস করলাম নীতাদিকে।

"এক্ষুনি আসছি" বলে নীতাদি প্রায় ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই যার হাত ধরে নীতাদি ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল, আমায় কেউ না বলে দিলেও চিনতে পেরেছিলাম—বব্ স্লেটর। সুদর্শন, সুপুরুষ, লম্বা চেহারা। পরনে কালো

রঙের সার্জের ট্রাউজারস্ আর সাদা শার্ট। গলায় বো-টাই। মুখে একটা মৃদু হাসি। নীতাদির মুখটা যেন কিসের আনন্দে ঝলমল। এত হাসিখুশী নীতাদিকে অনেকদিন দেখিনি। খুশী আর আনন্দ যেন উপচে পড়ছে। ছোটো ড্রয়িং-রুমটা তার কলহাস্যে মুখরিত। প্রায় ববের হাত ধরে টানতে টানতেই আমার কাছে নিয়ে এল।

"আলাপ কর—এ হোলো বব্, এখানকার ইঞ্জিনিয়ার।"

"হ্যালো হাউ ডু ইউ ডু।"

"হাউ ডু ইউ ডু। ইট ইজ এ প্লেজার।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই বব্ জমিয়ে তুলল। হেসে চেঁচিয়ে, দুরন্ত হাওয়ার মতোই শান্ত সন্ধ্যেটা তোলপাড় করে তুলল। আমি ছিলাম প্রায় নির্বাক্ শ্রোতা। মাঝে মাঝে দু-একটা হুঁ হাঁ ছাড়া আর কিছুই বলতে হয়নি আমাকে। শ্রোতা আর বক্তা দুইই ছিল নীতাদি আর বব্। অনর্গল কথা বলে চলেছে নীতাদি। যেন এতদিনের নিশ্চুপ, স্তব্ধ বেসুরো মনের তারগুলো সব একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে।

"জানিস্, বব্ খুব ভালো বাজায়"—নীতাদি বোধহয় আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেই কথাটা বলেছিল। ববের বেহালার সুর আমি শুনেছিলাম রতনবাবুর সঙ্গে আসতে আসতে কিন্তু ইচ্ছে করেই কথাটা চেপে গিয়ে বললাম, "তাই নাকি! তা একদিন গিয়ে শুনলেই হবে।"

"তা কেন! বেহালাটা ঠিক ওর গাড়ীতেই রাখা আছে। একদণ্ডও বেহালাটা নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে

পারে না।" তারপরেই ববের দিকে চেয়ে বললে, "কাম্ অন বব্। বী এ স্পোর্ট। গুড বয় কাম অন্।"

"ইফ ইউ মাস্ট ইনসিস্ট" বলে বব্ গাড়ী থেকে বেহালা আনতে গেল। কিন্তু কথার সুরে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম শুধু নীতাদির আগ্রহের অপেক্ষাই করছিল বব্। দু-মিনিটের মধ্যে বব্ বেহালা নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু সেই দু-মিনিটকেই যেন মনে হয়েছিল দুই যুগ। বব্ বেহালা আনতে গিয়েছে। ঘরের মধ্যে আমি আর নীতাদি বসে—কোনো কথা নেই কারুর মুখে। দুজনেই যেন দুটো স্ট্যাচু। নীতাদির দিকে আমি মুখ ফেরাতে পারছিলাম না আর নীতাদি মুখটা ঘুরিয়ে বই-এর পাতা উল্টোবার অছিলায় ছট্‌ফট্ করছিল। সে এক অসহ্য দু-মিনিট।

রাত তখন দশটা।

বব্ এসে বসল ল্যাম্প স্ট্যাণ্ডের নীচের চেয়ারটায়। দু-একবার ছড় টেনে বললে, "হোয়াট স্যাল আই প্লে ?"

আমি কিছু বলবার আগেই নীতাদি বলে উঠল, "প্লে দি ওয়ান ইউ ডিড্ ছাট নাইট অন মাই বার্থ ডে।" বব্ কি বাজাতে পারে সব জানে নীতাদি। আগেও যে অনেকবার বাজিয়েছে আর শুনিয়েছে নীতাদিকে। নীতাদির বার্থডেতেও বাজিয়েছে বব্। সেইটাই বোধহয় ছিল সব চেয়ে ভালো। কেন রতনবাবুই তো বলেছিলেন রোজ সন্ধ্যেবেলায় বব্‌সাহেব আসে তার ডাক্তারদিদির কাছে। এই জঙ্গলে তো দুজনেই শুধু মানুষ। অবাক্ হওয়ার তো কিছুই ছিল না আমার।

তবু কেমন যেন অবাক্ লাগছিল আমার। এ যেন অন্য নীতাদি। এসে যে মুখের ওপর বেদনার ম্লান ছায়া দেখেছিলাম এক নিমেষে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

নীতাদির কথাতেই সংবিৎ ফিরে পেলাম। "তুই জানিস্ না। আমাব জন্মদিনে কি সুন্দর যে বাজিয়েছিল বব্, তোকে কি বলব। কাউকে ডাকিনি শুধু ববকে ডেকেছিলাম সেদিন। রাত দুটো পর্যন্ত বাইরের বারান্দায় বসে বসে শুনেছি ওর বাজনা।"

"তাই বুঝি। তাহ'লে সেইটাই বাজাক না।" কোনো রকমে ঢোক গিলতে গিলতে বলেছিলাম। তারপর আর বেশী কিছু মনে নেই। অনেক রাত পর্যন্ত শুনেছিলাম ববের বেহালা। আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে সে রাতের কথা। আধ-শোয়া আধ-বসা বব্ তন্ময় হয়ে ছড় টানছে। ল্যাম্প স্ট্যাণ্ডের আলোটা তেরচাভাবে এসে পড়েছে ওর সুন্দর মুখটার ওপর আর খানিকটা পড়েছে পাশে বসা নীতাদির ওপর। ঘরের বাকী অংশ সব অন্ধকার। বব্ তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি রয়েছে নীতাদির ওপর। দুজনেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ। দুজনের চোখেই এক অপূর্ব সুন্দর, করুণ কিন্তু অব্যক্ত ভাষা। সেই সম্মোহিনী দৃষ্টি থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না নীতাদি। যেন সাপুড়ের বীণার সামনে সাপ। যতক্ষণ বীণা বাজবে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সাপ যেমন ফণা নাচিয়ে নাচিয়ে দুলবে, বীণার সুর শেষ হলেই হয় ছোবল মারবে নয়তো এঁকেবেঁকে ধীরে ধীরে ঝাঁপির মধ্যে ঢুকে পড়বে।

কতক্ষণ এইভাবে চলত জানি না। আমি বসেছিলাম ঘরের এক কোণে অন্ধকারে। ওরা আমায় দেখতে পাচ্ছিল না কিন্তু আমি ওদের সেই আধো-আলো আধো-ছায়ায় স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ নিজের অজ্ঞানতেই অন্ধকারের মধ্যে সিগারেট নেবাতে গিয়ে কাঁচের বড় অ্যাশ-ট্রেটা ঝন্‌ঝন্‌ ঝনাৎ করে ভেঙে মেজেতে পড়ে গেল।

বিরাট একটা আর্তনাদ করে বেহালাটা থেমে গেল আর একটা তার ছিঁড়ে গেল সশব্দে। নীতাদি যেন কি একটা বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখে হঠাৎ ভয় পেয়ে উঠেছে এমনিভাবে চেঁচিয়ে উঠল—"কি কি, কি হোলো ?"

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। কোনো রকমে বললাম, "আই অ্যাম সরী। আই বেগ ইয়োর পার্ডন।"

"ইট ইজ অলরাইট, প্লিজ ডোণ্ট বদার" বলে বব্‌ বেহালা নিয়ে উঠে পড়ল। তাকে এগিয়ে দিতে নীতাদি গেল পেছনে পেছনে। চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। বাইরে নীতাদি আর বব্‌-এর কথাবার্তা মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসছিল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানতেই পারি নি। ঘুম ভাঙলো নীতাদির ডাকে, "চল, খাবি না ?"

বাইরে কোথায় যেন ঢং ঢং করে রাত দুটো বাজল।

"বড় দেরি হয়ে গেল, নারে ?" নীতাদির মুখটা মনে হচ্ছিল দোষীর মতো।

"না, দেরি আর কি ?"

নিশব্দে দুজনে খেয়েছি। কোনো কথাই হয় নি। মাঝে

মাঝে ছুরি-কাঁটার টুং-টাং শব্দে সেই নিস্তব্ধতার বিরতি হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চুপচাপ নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে নীতাদিকে বলেছি,"চললাম শুতে নীতাদি।"

"আচ্ছা গুডনাইট। ভালো করে ঘুমোস্"—নীতাদি বলেছে। তারপর যতদিন ছিলাম নীতাদির কাছে রোজই সন্ধ্যেবেলা বব্ এসেছে। বেশ বুঝতে পারছিলাম ধীরে ধীরে নীতাদি আর বব্-এর মধ্যে একটা নিবিড় মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বোধহয় নীতাদির মনের আকাশে রং ধরেছে। ববের সম্পর্কে এসে হয়তো নীতাদি আবার হারিয়ে.যাওয়া মনের শান্তি ফিরে পেয়েছে। হয়তো বরুণের কথা ভুলতে চেয়েছে। মনে হয়েছিল এই বেশ ভালো, যদি নীতাদি মনে শান্তি পায়, যদি সব কিছু পুরোনো ব্যথা ভুলতে পারে, তাহলে তো আর বলার কথা কিছুই থাকতে পারে না। যদি তার জীবনটা একটু রঙীন হয়ে আসে তা'হলে কারই বা কি আর কতটুকু ক্ষতি হতে পারে? সবই হয়তো ঠিক কিন্তু কেন জানি না আমার যেন একটু খট্‌কা লাগছিল। মনের কোথায় যেন কি একটা খচ্‌খচ্ করে বিঁধছিল। বার বারই বরুণের কথা মনে পড়ছিল। কিছুতেই আমি বরুণকে দোষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারছিলাম না। বরুণ আর নীতাদির ছাড়াছাড়িতে হয়তো কোনো নাটকীয়তাই ছিল না। হয়তো কোনো যুক্তিই ছিল না। কিন্তু তবুও কোথায় যেন কেমন করে তারটা হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেই পুরোনো সুর আর হয়তো বেজে উঠবে

না। কেউ কাউকে ভুল বুঝল না, কেউ কাউকে দোষ দিল না, কেউ কাউকে অস্বীকার করল না, কেউ কারোর আদর্শকে খর্ব করল না অথচ কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল। বরুণ হঠাৎ চলে গেল বিলেত। কোনো কথা হোলো না, কোনো প্রতিশ্রুতি, কোনো অঙ্গীকার, কোনো মান-অভিমান হোলো না। চুপচাপ দুজনে অন্যের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। কত কিছু কথা হয়তো ছিল, তা বলা হোলো না। কত ব্যথা হয়তো দুজনের মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, তা মনের মধ্যেই রয়ে গেল। একটা অব্যক্ত বেদনা হয়তো দুজনের মনের মধ্যে গুমরে গুমরে কাঁদছে—হয়তো জীবনভোর কাঁদবে। কে জানে?

ছয়

বব্ আর নীতাদিব ধীরে ধীবে গড়ে ওঠা ঘনিষ্ঠতা মাঝে মাঝে হয়তো আমার কাছে বিসদৃশ ঠেকেছে কিন্তু এত সাধারণ এত খোলাখুলিভাবে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে তার মধ্যে দৃষ্টিকটু কিছুই ছিল না। হয়তো বরুণের কথাই আমার সব সময় মনে পড়ত বলেই আমার কাছে বিসদৃশ লাগত। হয়তো আমি কোনোদিন নীতাদির দিক্‌টা ভেবে দেখিনি। কিন্তু একদিন আমার সব ধারণা, আমার সব চিন্তাধারা আবার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বুঝতে কিছুই পারলাম না কিন্তু সেদিন নীতাদিকে মনে হয়েছিল নিষ্ঠুর, স্যাডিষ্ট। আজও হয়তো নীতাদিকে আমি বুঝতে পারিনি, হয়তো কোনোদিনই পারব না। কিন্তু সেদিন নীতাদিকে মনে হয়েছিল হেঁয়ালীর মতো। আমার সামনে নীতাদি হয়েছিল এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। নীতাদি আমার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা জটিল ধাঁধার মতো।

সেদিন ছিল ববের জন্মদিন। বিরাট আয়োজন করেছিল বব্। মাইন্‌স-এর সব সাহেবসুবোরা আর অনেকেই এসেছিল নিমন্ত্রিত হয়ে। নীতাদির অতিথি বলে আমিও ডাক পেয়েছিলাম সেই আনন্দোচ্ছল সন্ধ্যেতে। গান হৈ-হল্লা আর হুইস্কীর জোয়ারে কখন যে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়েছে বুঝতেই পারিনি। বেহালার ছড় টেনে আবার অদ্ভুত এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল বব্। ওর হাতে বোধহয় জাদু

ছিল। নীতাদিও সেদিন গান গেয়েছিল। নীতাদি যে এমন সুন্দর গান গাইতে পারে তা জানতাম না। বাকী অতিথিদের সঙ্গে গল্পে মশগুল ছিলাম, তাই দেখতেই পাইনি কখন নীতাদি আর বব্ সবাইকার চোখের অগোচরে হল থেকে চলে গিয়েছে।

ড্রয়িং-হল আর ডাইনিং-রুমের মধ্যে কাঁচের পার্টিশান। পার্টিশানের এদিকে ড্রয়িং-হলের মাঝামাঝি বব্ তৈরি করেছে ছোটোখাটো সুন্দর করে সাজানো একটা বার্। পার্টিশানের কাছে গিয়ে বার্ থেকে বোতলটা নিয়ে গেলাসে হুইস্কী ঢালতে যাচ্ছি হঠাৎ কানে চাপা চাপা কথাগুলো ভেসে এল।

"বাট্ নীতা"—ববের গলা।

"নো বব্"।—নীতাদি।

"হাউ, হাউ ক্যান ইউ বী সো হার্টলেস্ নীতা"। আবার বব্।

"প্লীজ বব্, প্লীজ, ইট ইজ ইমপসিবল্। আই কুডণ্ট, আই সিম্পলি কুডণ্ট"—নীতাদির গলাটা ধরে এসেছে।

"বাট্ অল দীজ ডেজ।" ববের গলাটাও কেঁপে উঠল।

"নো বব্। ইউ টুক ইট অল রং বব্। হাউ কুড ইউ। হাউ কুড ইউ?"

"আই টুক ইট অল রং?" বব্ যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না নীতাদির কথা।

"ইয়েস বব্ বিলিভ মি"—নীতাদি মনে হোলো কাঁদছে।

কাঁচের এ পাশ থেকে স্পষ্ট দেখলাম দুটো ছায়া দুলে

উঠল। বব্ নীতাদির মুখের কাছে প্রায় ঝুঁকে পড়ল আর শুনতে পেলাম নীতাদির কাতর মিনতি "নো বব্। প্লিজ বব্।" নীতাদি দু হাত দিয়ে ববকে সরিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি পার্টিশানের কাছ থেকে সরে এলাম আর তার পরমুহূর্তেই প্রায় ছুটে নীতাদি ডাইনিং-রুম থেকে বেরিয়ে এল। মুখ চোখ যেন ফেটে পড়ছে কিসের এক অব্যক্ত বেদনায়, কিসের এক অসহনীয় যন্ত্রণায়। দুঃখে আর রাগে থমথমে লাল মুখ। দূর থেকে সবাইকে দেখে হাসার চেষ্টা করল। হাসি বেরোল না। চেহারা দেখে মনে হোলো যেন একটা ঝড় ওর ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। রাত তখন অনেক হয়েছে।

কে যেন হঠাৎ গেয়ে উঠল, "বব্ ইজ এ জলী গুড ফেলো, বব্ ইজ এ জলী গুড ফেলো।" ঘরের মধ্যে একরাশ লোক, কিন্তু কেউ কিছুই বুঝতে পারল না যে কোথায় যেন একটা ছন্দপতন হয়েছে। বার্থডে কেক্ কাটার সময় নীতাদির "হ্যাপী বার্থডে টু ইউ" গান গাওয়ার সেই চেষ্টা আমি কখনও ভুলব না। কেকের পাশে সাজানো মোমবাতির শিখা নেভাবার সময় ববের সেই ছলছলে চোখ আর লাল আগুনের আভায় তার সেই থমথমে মুখের ভাবও আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

রাতে যখন নীতাদির সঙ্গে বাড়ী ফিরেছি কোনো কথাই হয় নি দুজনের মধ্যে। চুপচাপ যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছি। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছে। কান পেতে শুনেছি নীতাদির সেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বুক-ভাঙা কান্না

"না বব্ না। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, প্লিজ বব্, প্লিজ।" অনেকক্ষণ ধরে চলেছে সেই কান্না। যত ব্যথা, বেদনা যন্ত্রণা, সব বুঝি সেই কান্নার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। ভেবেছিলাম কিছু বলব না। কাঁদলে হয়তো মনের ভারটা অনেক লাঘব হবে। কিন্তু পারি নি চুপচাপ বসে থাকতে। পা টিপে টিপে নীতাদির ঘরে গিয়েছি। বালিশের ওপর উপুড় হয়ে তখনও কাঁদছে নীতাদি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আস্তে আস্তে উপুড় হয়ে শোওয়া নীতাদির কাঁধে হাত রেখেছি। ধীরে খুব ধীরে কানের কাছে মুখটা এনে ডেকেছি "নীতাদি।"

"কে?" বলে চমকে উঠেছে নীতাদি।

"কেন এমন করছ নীতাদি। কেন তুমি এত কষ্ট নিজেকে দিচ্ছ," বলে নীতাদির মাথার ঘন কালো চুলে হাত বুলিয়েছি।

নীতাদি আর থাকতে পারে নি। তার পরক্ষণেই আমায় জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। একটা কথাও বলে নি শুধু কেঁদেছে আর আমিও কোনো প্রশ্ন করে নি। আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি আর এক সময় নীতাদি ঘুমিয়ে পড়েছে। গাল বেয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছে ঘুমের মধ্যেই। বড় বড় ফোঁটা। যেন এক একটা মুক্তো। দূর থেকে ভেসে আসছিল ববের বেহালার সুর। সে সুরে কি ছিল জানি না কিন্তু মনে হচ্ছিল ববের বেহালার প্রতিটি তার বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছে। ছড় দিয়ে এক একটা টান দিচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল কে যেন তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ববের বেহালা তখন থামে নি। শুধু থামে নি বললে ভুল বলা হবে। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বেহালার সেই সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল 'কালো সোনা'র পাহাড়ে পাহাড়ে। আধো-আলো আধো-আঁধারের সেই প্রতিটি মুহূর্ত কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মনে হচ্ছিল যে বাজাচ্ছে তার নিজের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েই বোধহয় সুর বেরোচ্ছে।

এক সময় আচমকা ঘুম থেকে উঠেছে নীতাদি। উঠেই কানে হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠেছে, "বন্ধ করতে বল। বন্ধ করতে বল। আমি আর শুনতে পারছি না। প্লিজ একবারটি গিয়ে ওকে বল বেহালা বাজানো বন্ধ করুক। ফর মাই সেক্।"

"অমনি করো না নীতাদি। ঘুমবার চেষ্টা কর।" নীতাদিকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছি।

"বলতে পারিস কেমন করে ঘুমবো আমি। ওকে বন্ধ করতে বল।" তারপরে আমি কিছু বলবার আগেই নিজেই বিছানা থেকে উঠে জানালার কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে জানালাটা বন্ধ করে চুপচাপ এসে শুয়ে পড়ল। বেহালার সুর তখনও শোনা যাচ্ছে কিন্তু খুব মৃদু, অস্পষ্ট। যেন কেউ অনেক অনেক দূরে বাজাচ্ছে সেই করুণ রাগিণী আর বাতাসে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে তার রেশ।

পরের দিন নীতাদি রোজকার মতোই কাজে বেরিয়েছে। রোজকার মতোই ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে আমার সঙ্গে হাসি

ঠাট্টা করেছে। যেন কিছুই হয় নি। কালকের রাতটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন যা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে। সন্ধ্যে হয়ে আসতেই নীতাদি আবার যেন কেমন হয়ে গেল। কোথায় সেই হাসি কোথায় সেই প্রাণখোলা কথা। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা গড়ালো রাতে। বার বার ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়েছে নীতাদি। বার বার কান পেতেছে, কারো পদশব্দ শোনার আশায়। বাড়ীর সামনে দিয়ে কোনো গাড়ী গিয়েছে আর ছুটে বেরিয়েছে বারান্দায়। আবার ফিরে এসেছে ঘরের মধ্যে। ল্যাম্পস্ট্যাণ্ডের নীচের চেয়ারটায় অনেকক্ষণ বসেছে। রাতে চুপচাপ দুজনে খেয়েছি। আবার কাঁটা-ছুরির টুং-টাং শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় নি। ববের বেহালাও শুনতে পাইনি সে রাতে।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় বসেছিলাম একা। নীতাদি আবার গিয়েছিল বাবুরাও-এর বাড়ী। একা একা বসে কি সব আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম কে জানে। হঠাৎ বাইরে রতনবাবুর গলার আওয়াজ পেলাম, "আসতে পারি স্যার। আমি টাইম-কীপার রতনবাবু।"

"আরে আসুন আসুন। আপনার তো পাত্তাই নেই। আপনার সঙ্গে তো ভালো করে আলাপই হোলো না"—রতন বাবুকে অভ্যর্থনা জানালাম।

"থাক্ থাক্ মশাই, আর মায়া বাড়াবেন না। কি দরকার মায়া বাড়িয়ে আবার। এই তো বেশ আছি। আমি করে যাই আমার টাইম-কীপারির কাজ আর আপনি করে যান

আপনার নিজের কাজ। দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন। আলাপ পরিচয় হোলো। দু'দণ্ড হাসি-তামাশা হোলো। চলে গেলেন ফুরিয়ে গেল। বেশী আলাপের দরকারও নেই, লাভও নেই।"—রতনবাবুর গলায় যেন কি একটা ওঠানামা করছে। কাঁপা কাঁপা অভিমানভরা গলার স্বর।

"কি ব্যাপার রতনবাবু?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ব্যাপার আবার কি? ব্যাপার কিছুই না। আমার আর কি? ছোটো ছাপোষা টাইম-কীপার। কর্তারা যা হুকুম দেবেন তা পালন করা বৈ তো আর কিছু না। নয় তো আমার কি দরকার কে আসে আর কে যায়।"

"কি হেঁয়ালী করছেন মশাই। কে আবার এল গেল?"

"হেঁয়ালী! এই দেখ, আপনার বুঝি হেঁয়ালী লাগল। আজ ভোরে বব্ সাহেব চলে গেল।"

"কি বলছেন আপনি?" চমকে উঠেছিলাম।

"ঠিক বলছি। মিথ্যে বলে তো আমার কোনো লাভ নেই আর হেঁয়ালীও নেই এর মধ্যে। কাল রাতে আমায় ডেকে বলল এখান থেকে পঞ্চাশ না একশো মাইল দূরেই কোনো এক কয়লার খনিতে তার জন্যে ভালো অফার ছিল ভালো মাইনেতে তাই সে সেখানে চলে যাচ্ছে। আমাকে বলল আপনাদের খবর দিতে, তাই এলাম। ডাক্তারদিদিকে এই চিঠিটা দিয়েছে, দিয়ে দেবেন।

দু-লাইনের ছোট চিঠি—"Angel. I am sory Forgive

me. But Don't forget me. But this pain is too much—Bye—Bob".

("অ্যাঞ্জেল। আই অ্যাম সরী। ফরগিভ মি। বাট্ ডোণ্ট ফরগেট মি। বাট্ দিস্ পেন ইজ টু মাচ্। বাই—বব্।)

কখন যে রতনবাবু ঘর থেকে চলে গিয়েছিলেন বুঝতেই পারিনি। তার ফিরে আসার শব্দে সংবিৎ ফিরে পেলাম। রতনবাবু বললেন, "আমি স্যার ভুলেই গিয়েছিলাম। সাহেব এইটাও ডাক্তারদিদিকে দিয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, যে যাবার তাকে আর কে রুখবে বলুন। যাক, এই জানোয়ারদের দেশে দুটো মানুষই ছিল। একটা তো গেল। আরেকটা থাকল। সেটাও হয়তো কোনোদিন চলে যাবে। গেলেই ভালো। আমরা জানোয়াররা আবার একাই থাকব।"

ল্যাম্পস্ট্যাণ্ডের নীচে চেয়ারটার ওপর দুম করে ববের বেহালাটা রেখে রতনবাবু কি সব বিড়বিড় করতে করতে চলে গেলেন গট্‌গট্ করে।

*

ছুটি আমারও ফুরিয়ে আসছিল। ফিরে যাবার সময় এসে গিয়েছে। ভেবেছিলাম বেশ কদিন হৈহৈ করা যাবে নীতাদির এই পাহাড় আর জঙ্গল-ঘেরা ছোট্ট বসতিতে। কিন্তু কেন জানি না নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও জড়িয়ে পড়েছিলাম অন্যের সুখ দুঃখে। নীতাদিকে ফেলে যেতে মন চাইছিল না, কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। আমায় আবার ফিরে যেতে

হবে ব্যস্ত কোলাহলময় কলকাতাতে, আবার ডুবে যেতে হবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আর নীতাদি হয়তো এখানেই পড়ে থাকবে তার বাকী জীবনটা। আমি জানি নীতাদি হয়তো কাঁদবে না। কিন্তু গুমরে গুমরে থেকে তার জীবন হয়ে উঠবে দুর্বিষহ।

আর বব্। সে হয়তো আবার নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে কাজের মধ্যে। সন্ধ্যেবেলা হয়তো আবার বসে নতুন বেহালা নিয়ে আর তার থেকে হয়তো আরো করুণ রাগিণী বের হয়। হয়তো বা বেহালা আর সে বাজাবেই না।

ববের পাঠানো চিঠিটা হাতে নিয়ে কত কি সবই না ভাবছিলাম। আচ্ছা নীতাদি কি সত্যিই বব্‌কে ভালোবাসত আর যখন জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যার সামনে পড়েছিল, সেই চরম মীমাংসা করতে তখন কি নীতাদি নিজের আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস সব হারিয়ে ফেলেছিল আর তারই দুর্বল মুহূর্তে বব্‌কে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বব্ কি সেদিন কাঁচের পার্টিশানের ওপাশে দাঁড়িয়ে নীতাদিকে 'প্রপোজ' করেছিল। হয়তো এ সবই ভুল। হয়তো নীতাদি বব্‌কে ভালবাসেনি। হয়তো ববের প্রতি তার স্নেহ আর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতাকে বব্ ভুল করে প্রেমের আখ্যা দিয়ে বসেছিল। তা যদি না হয়ে নীতাদি সত্যিই বব্‌কে ভালবাসতো, তাহলে তাকে কেন ফিরিয়ে দিল। কিন্তু নীতাদি কি সত্যিই এত নিষ্ঠুর, এত হৃদয়হীনা যে সে চিরকালের জন্যে বরুণকে তার মন থেকে মুছে ফেলেছে, না বরুণের ওপর অভিমান করেই

নিজেকে ঠকাতে গিয়ে, নিজেকে ভুলতে গিয়ে, নিজের জীবনের ব্যর্থতা ভুলতে গিয়ে বব্‌কে হঠাৎ ভালবেসে ফেলেছিল, না বরুণের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমায় দেখাবার জন্যে ববের সঙ্গে ভালবাসা আর মন দেওয়া-নেওয়া কৃত্রিম নাটক রচনা করছিল? কিন্তু রতনবাবুই তো বলেছিলেন দুজনে খুব বন্ধু। রোজই সন্ধ্যেবেলা নাকি বব্‌ আসে নীতাদির বাড়ি। তাহ'লে সে তো আমার আসার অনেক আগে থেকেই। তবে। ভেবে কিছুই কূল-কিনারা করতে পারছিলাম না। এমন সময় নীতাদি ঘরের মধ্যে ঢুকল।

"কি রে এমন চুপচাপ অন্ধকারে বসে আছিস যে। আলোটা জ্বালবার কথাও মনে পড়েনি বুঝি"—বলে নীতাদি আলোটা জ্বালল। আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সাপ দেখলে মানুষ যেমন ভয়ে আঁতকে পেছিয়ে আসে নীতাদিও প্রায় লাফ দিয়ে সরে এল।

"কি হোলো নীতাদি?"

নীতাদির মুখটা ফ্যাকাশে, মড়ার মতো। শুধু মুখ দিয়ে একটা কথাই বেরোলো, "ওটা। ওটা কি? ওটা এখানে এল কি করে। ওকি এখানে—।" ল্যাম্পস্ট্যাণ্ডের নীচে চেয়ারটার ওপর রাখা ববের বেহালাটা পড়েছিল। নীতাদি ধীরে ধীরে এগোতে লাগল চেয়ারটার দিকে।

"না বব্‌ আসেনি। ওটা রতনবাবুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। বব্‌ এখানে আর নেই। আজ ভোরবেলা চলে গিয়েছে।"

"কে বলল তোকে"—চিৎকার করে উঠল নীতাদি। "কে বলল তোকে।"

"রতনবাবু বলে গেলেন খানিকটা আগে।"

"রতনবাবু, সেই বুড়ো টাইম-কীপারটা। তার বুঝি এত সাহস হয়েছে যে আমার সঙ্গে রসিকতা করতে তার একটুও সঙ্কোচ হোলো না।"

"বতনবাবু রসিকতা করেন নি। এই নাও চিঠি।"

প্রায় আমাব হাত থেকে ছোঁ মেরেই চিঠিটা কেড়ে নিয়ে নীতাদি দৌড়ে ঘর থেকে বেবিয়ে গেল। তার পরমুহূর্তেই আবার শুনতে পেয়েছিলাম নীতাদির সেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে কান্না। এবার আর বাধা দিইনি। সে-রাতে টেবিলে একাই খেয়ে শুয়ে পড়েছি। নীতাদি বোধহয় খায়নি।

সকালের ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসেই নীতাদিকে কথাটা বলেছিলাম। "আমার তো ছুটি শেষ হয়ে গেল। এইবার তো আমাকে যেতে হয়।"

"ওঃ, তোরও বুঝি ছুটি ফুরিয়ে এল। তুইও যাবি। গেলে আর কি করা যাবে। যেতে যখন হবেই তখন যাবি। নিশ্চয় যাবি। আমি আর কি করে বাধা দেব বল। সবাই যাবে। শুধু থাকব আমি। আমারই ছুটি নেই আর তাই ছুটি ফুরোবার বালাই নেই।"

"কি যাতা বলছ।"

"যাতা বলছি বুঝি। হবে। যাক, কবে যাবি ঠিক করলি?"

"তা দিন চারেকের মধ্যেই রওনা হতে হবে। বেশ লাগছিল এখানে। আবার সেই কাজ, কাজ আর কাজ।"

"তাই নাকি? তোর ভালো লাগছিল। আমার কাছে এসেও যে কারোর ভালো লাগতে পারে, এ আমি ভাবতেই পারি না।"

"আবার যাতা বলছ।"

"না না, আর বলব না"—নীতাদি শুকনো হেসে বলেছিল।

যাবার দুদিন আগে চায়ের টেবিলে বসে হঠাৎই নীতাদি করেছিল প্রস্তাবটা।

"চল তোর সঙ্গে আমিও ফিরে যাই। কদিনের ছুটি নিয়ে ঘুরে আসি।"

"তুমি যাবে কলকাতায় আমার সঙ্গে। ঠিক বলছো?" কথাটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। হঠাৎ এই মত পরিবর্তনের কি কারণ থাকতে পাবে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। নীতাদি বোধহয় আমার প্রশ্নের জন্য তৈরীই ছিল।

বললে, "কেন কি হয়েছে? কলকাতা যাওয়া কি আমার মানা নাকি?"

"না, তা না। তুমি এমনভাবে হঠাৎ কাউকে না জানিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছিলে যে মনে হয়েছিল, তুমি হয়তো আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্কই ত্যাগ করলে আর হয়তো কোনোদিন কলকাতা ফিরে যাবে না।"

"ইচ্ছে করলেই কি সব সম্পর্ক ত্যাগ করা যায় মে।

তাছাড়া আর কলকাতা কখনও ফিরে যাব না কই এমন কথা তো বলিনি।"

"এও তো বলনি যে কখনও ফিরে যাবে।"

"তাই ভেবে নিলি আর যাব না।"

."না বললেও আমার তাই মনে হয়েছিল।"

"তোর তো আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই মনে হয়। তুই বড্ড বেশী ভাবিস আমার জন্যে কিনা তাই • তোর এত বেশী চিন্তা।"

রওনা হবার আগেই আরেকটা অদ্ভুত প্রস্তাব করেছিল নীতাদি। কলকাতা যাওয়ার প্রস্তাবটা প্রথমে বিশ্বাস হয়নি কিন্তু এই প্রস্তাবটা শুনে রীতিমতো চমকে গিয়েছিলাম। কিছুতেই যেন বুঝতে পারছিলাম না এটা কি করে সম্ভব হতে পারে।

সাত

হঠাৎই বলেছিল কথাটা নীতাদি। খুবই সাধারণভাবে। এত সাধারণভাবে যে এই কথাটা নীতাদি বলতে পারবে তা নিজের কানে না শুনলে হয়তো বিশ্বাসই করতাম না। সুটকেশ গোছাচ্ছিল নীতাদি। বাইরে জীপ তৈরী। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কি নীতাদি, রেডি ?"

"হ্যাঁ। পাঁচ মিনিট। কেবল একটা কথা।"

"আবার কি কথা। কলকাতা যাবে না ঠিক করলে এই তো। আমি জানতাম।"

"তুই বড় বেশী জানিস। কলকাতা ঠিকই যাব। তবে—।"

"তবে আবার কি ?"

"কিন্তু তার আগে।" আমতা-আমতা করে বললে নীতাদি।

"তার আগে আবার কি ?"

"তার আগে চল একবার ববের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"কার সঙ্গে ?" আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

"ববের সঙ্গে।" খুবই সাধারণ সহজভাবে বলেছিল নীতাদি। হয়তো নিজের রাগটা সামলাতে পারিনি তাই বেশ জোরেই বলেছিলাম,—"তুমি ভেবেছ কি ? কেন বব্ তোমার কি ক্ষতি করেছে। সে তো নিজে থেকেই তোমার জীবন থেকে সরে গিয়েছে। কেন আবার তাকে যন্ত্রণা দেবে। সে তো তোমার কাছ থেকে কিছুই চায়নি।"

"তুই থামবি ?"—নীতাদির গলার স্বর তখন বেশ উঁচুতে উঠেছে।

"না, অনেকদিন চুপ থেকেছি আর থাকব না। লোককে এমন কষ্ট দিয়ে তুমি কি আনন্দ পাও তাতো আমি বুঝি না। একটা লোকের জীবন তো ছারখার করে দিয়েছ। আরেকটা লোককে আর কেন মারতে চাইছ। তুমি কি একটা স্যাডিস্ট ?"

আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়নি নীতাদি কিন্তু চোখ থেকে টস্‌টস্‌ করে জল গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল।

"সরি নীতাদি"—বলে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। কখন যে নীতাদি এসে কাঁধে হাত দিয়েছে বুঝতে পারি নি। তখনও চোখের জল শুকোয় নি। ধীরে ধীরে বলেছিল, "শোন্‌। রাগ করিস না। সবাই তো আমায় ভুল বুঝল। শেষ পর্যন্ত তুইও ভুল বুঝবি। তুইও বুঝবি না আমার ব্যথাটা ?"

"তোমার আবার ব্যথা আছে নাকি ?"

"নেই ? আমি কি মানুষ না ?"

"কি জানি, মনে তো হয় না।"

"দেখ, তোর সঙ্গে আজ আর ঝগড়া করব না, তর্কও করব না। কিন্তু আমার কথাটা শোন্‌। আমি সত্যিই একবার দেখা করতে চাই ববের সঙ্গে। তাকে শুধু বলব সে যেন আমায় ভুল না বোঝে। আমি জানি আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক বব্‌ আমার কথা বুঝবে। সেদিন তাকে সব বোঝাতে পারি নি।"

"কেন পার নি?"

"কেন পারিনি সে কথা আজ বলে হয়তো কোনো লাভ নেই। হয়তো সে বুঝতে চায় নি। আমায় বোঝবার সময় বা সুযোগ দেয় নি। তাকে কি করে বোঝাতাম যে সে একটা মস্ত ভুল করে বসে আছে। তাকে কি করে বোঝাতাম যে সে আমায় ভুল বুঝেছে। কি করে বোঝাতাম যে তাকে আমার ভালো লাগত কিন্তু তাকে আমি ভালো বাসতে পারিনি। এই ভালো লাগার আর ভালো বাসার সূক্ষ্ম তফাতটা তাকে আমি কি করে বোঝাতাম? আর বোঝালেই যে সে বুঝতে পারত তাই বা কি করে বলি। তাকে আমার ভালো লাগত। খুব ভালো লাগত। তাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। সম্মান দিতাম একটা সুন্দর মানুষকে। তাকে কি করে বোঝাতাম যে আমার ভালো লাগাকে সে ভালবাসা ভেবেছে। আমার শ্রদ্ধাকে ভেবেছে অনুরাগ। তুইই বল এত কথা ওকে আমি কি করে সেই রাতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বোঝাতাম। সে বিদেশী। তাকে কি করে বোঝাতাম আমরা বার বার ভালবাসতে পারি না"—এক সঙ্গে কথাগুলো বলে নীতাদি চুপ করল।

নীতাদির শেষ কথাটায় বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। মনে হোলো অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে কোথায় একটা ক্ষীণ আলোর রশ্মি বোধহয় খুঁজে পেয়েছি। 'আমরা বার বার ভালবাসতে পারি না।' তার মানে কি নীতাদি এই বলতে চায় যে সে এখনও বরুণকে ভালবাসে। না তার মানে তো

এও হতে পারে যে একবার সে ভালবেসেছে একজনকে আর ঠকেছে সুতরাং ভালবাসার কোন দামই আর তার কাছে নেই। হয়তো এও মানে হতে পারে "ইট ইজ বেটার টু হ্যাভ লাভড্ অ্যাণ্ড লস্ট্ দ্যান টু হ্যাভ নেভার লাভড্ অ্যাট অল্।"

"তাহলে বরুণ। বল, সেও তোমায় ভুল বুঝেছে?" হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম। নীতাদির চোখে তখনও জল চিক্‌চিক্ করছে। এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

"তুই কেন বুঝতে পারছিস না। কেন বুঝতে পারছিস না যে বরুণকে আমি আজও ভালবাসি। হয়তো বরুণকে আমিই ভুল বুঝেছি। বরুণ অনেক বড়। অনেক উঁচু। তার মতো আদর্শ আমার নেই। তাই ভয় হয়েছিল আমার জন্যে যদি তার আদর্শ খর্ব হয়। তাই দূরে সরে যেতে চেয়েছিলাম বরুণের কাছ থেকে; কিন্তু বরুণ আমি ছাড়াও চেয়েছিল অনেক কিছু। সে চেয়েছিল যশ, মান, প্রতিষ্ঠা, সাফল্য, অর্থ। আমি থাকলে হয়তো তার সব আশা, আকাঙ্ক্ষা কিছুই পূর্ণ হোতো না। আমার পৃথিবী শুধু বরুণকে নিয়েই ছিল। কিন্তু তার পৃথিবী ছিল যে আরো অনেক বড়, অনেক ব্যাপক।"

"তাহলে তাকে চিঠি লিখছ না কেন?"

"আমি কি জানি সে কোথায়। তাছাড়া কি দরকার? সে কি আমায় জানে না, আমায় বোঝে না? থাক এ সব কথা এখন। অনেক সময় পাব তোর সঙ্গে এ সব আলোচনা করতে। তুই শুধু আমার কথা শোন্। কতই বা দূর এখান

থেকে ববের কোলিয়ারী। কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা করেই সোজা নাগপুর চলে যাব আর সেখান থেকে কলকাতা। কেমন?"

আমার সব প্রশ্নের, সব সংশয়ের আর সন্দেহের উত্তর সেদিন হয়তো নীতাদির কাছ থেকে পাইনি কিন্তু আর কোনো প্রশ্নও নীতাদিকে জিজ্ঞেস করিনি। সোজা জিনিস-পত্র নিয়ে বাবান্দায় চলে এসেছি। কিন্তু বারান্দায় এসেই আবার অবাক্ হয়েছি। বারান্দাব ওপরেই উঠে এসেছে ছোটোখাটো জনতার এক মিছিল। অনেকেই রয়েছে। সবাইকে চিনতাম না কিন্তু এই কদিনেই যে কয়েকজনকে চিনতে পেবেছিলাম তাবাও দেখলাম সবাই রয়েছে। সুকিয়াবাঈ, বাবুবাও, মোতিরাম আরো অনেকে। সব শেষে এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে টাইম-কীপার রতনবাবু।

"কি ব্যাপাব? কেয়া হ্যায় বাবুরাও?" নীতাদি জিজ্ঞেস করল। কেউ কোনো কথাই বলল না। রতনবাবু সামনে আসতেই নীতাদি বললে,—"কি হয়েছে রতনবাবু? আবার কি গোলমাল? বাবুরাও-এর কি আবার মাইনে কাটা গিয়েছে নাকি? ছুটিতে যাচ্ছি তাও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কি জ্বালাবেন আপনারা সবাই আমাকে?"

রতনবাবু বললেন,—"না দিদি, গোলমাল কিছুই না। আপনি ছুটিতে যাচ্ছেন তাই এরা এসেছে আপনাকে বলতে যে আপনি যেন না যান।"

"তার মানে?"

"এদের ধারণা আপনি আর এখানে ফিরে আসবেন না ?"

"এরা না হয় সব অশিক্ষিত লোক। আপনি তো আর তা নয়। আপনি কেন বুঝিয়ে বললেন না যে আমি কদিন পরেই আবার ফিরে আসব।"

"টাইম-কীপারি করতে করতে আর শিক্ষার সময় কোথায় পেলুম দিদি ? তা এদের আমি কি ছাই বোঝাব। আমি যে নিজেই নিজেকে বোঝাতে পারছি না। আমি যে নিজেই বুঝেছি আপনি আব ফিরে আসবেন না।"

"কি যাতা বলছেন আপনি। কেন আসব না ?"

"যাতা হয়তো বলছি। কিন্তু কেন তা জানি না। কিন্তু এইটা বেশ জানি যে আপনি আর আসবেন না। দিদি, টাইম-কীপারি করতে করতে মাথার সব চুল পেকে গেল। কত দেখলাম, কত শুনলাম। ভালো লোক তো থাকে না এখানে। যারা যায় তারা আব ফিবে আসে না। টাইম-এর এই তো মহাগুণ। কই থাকল বব্ সাহেব ? রাখতে পারলেন তাকে ?"

"বব্ সাহেবেব সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ?" যেন চাবুক খেয়েছে নীতাদি এমনিভাবে আর্তনাদ কবে উঠল।

"সম্পর্ক আমার সঙ্গেও নেই আপনার সঙ্গেও নেই। সম্পর্ক শুধু ঐ যে বললাম টাইম-এর সঙ্গে। ভালো লোকদের সব চলে যাবার টাইম এসে গিয়েছে। বাজে লোকদের মানে আমাদের মতো লোকদের কোনো টাইম নেই। আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকব। এ তো জানোয়ারদের

বসতি। শুধু জানোয়াররাই থাকবে এখানে। নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করে মরবে। মানুষ আর কি দুঃখে এখানে থাকবে বলুন ?" রতনবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন।

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল বাবুরাও-এর স্ত্রী সুকিয়াবাঈ। নীতাদির পায়ে লুটিয়ে পড়ে তার সে কি কান্না : "বাঈসাহাব, তুম মত যাও। বাবুরাও আউর কভী শরাব নহী পিয়েগা। মহাদেবজীকা কসম খায়া।" হাত জোড় করে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে বাবুরাও আর ঘন ঘন মাথা নেড়ে বউ-এর কথায় সায় দিচ্ছে।

"নহী নহী হম জরুর আয়েগা," —সুকিয়াবাঈকে অতি কষ্টে উঠিয়ে নীতাদি জীপে গিয়ে উঠল। পেছনে পেছনে আমি উঠলাম। জীপটা যখন গেট ছাড়িয়ে লাল মাটি ওড়ানো রাস্তার বাঁকে মোড় ঘুরছে, পেছন ফিরে দেখলাম টাইম-কীপার রতনবাবু কোটের ময়লা আস্তিন দিয়ে চোখ মুছছেন। মনটা একটু ভারী হয়ে গেল। দূর থেকে তখনও দেখতে পাচ্ছিলাম 'কালো সোনা'র পাহাড়। কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল জায়গাটার ওপর। নীতাদি হয়তো ফিরে আসবে, হয়তো বা আসবে না কিন্তু আমি আর আসব না। অনেক স্মৃতি নিয়ে যাচ্ছিলাম 'কালো সোনা'র দেশ থেকে। সেই স্মৃতির বোঝা হয়তো চিরকালই বয়ে বেড়াতে হবে। টাইম-কীপার রতনবাবু, বাবুরাও, সুকিয়াবাঈ সবাইকার কথাই মনে থাকবে! আর মনে থাকবে বব্-এর কথা। কদিনেরই বা আলাপ কিন্তু কেন যেন বব্কে ভালবেসে ফেলেছিলাম।

অনেকদিন পরে একদিন ববের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। বব্‌কে বলেছিলাম নীতাদির সব কথা, বরুণের কথা। তাদেব ভুল বোঝাবুঝির কথা। চুপচাপ সব শুনেছিল বব্। মাঝে মাঝে শুধু বলেছে, 'আই সী, আই সী'। যন্ত্রণায় তার বীভৎস মুখটা আরো বেশী বীভৎস হয়েছে। কাটা হাতের কনুইটা দিয়ে ঘন ঘন কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছেছে। হয়তো বব্ বুঝেছে আমার কথা, হয়তো বোঝেনি। হয়তো নীতাদির দিকটা বুঝতে পেরেছে, হয়তো পারেনি। কে জানে। কিন্তু এইটুকু সে বেশ বুঝেছিল নীতাদির জীবনের সঙ্গে সে নিজেকে জড়াবে না। তার জীবন হয়ে উঠেছিল অভিশপ্ত। তার জীবনের কালো অশুভ ছায়া নীতাদির জীবনের ওপর সে পড়তে দেবে না। তাব নিজের দেশে ফিরে যেতে চেয়েছিল বব্।

একদিন ববের সঙ্গে বরুণেরও দেখা হয়েছিল। আমিই ব্যবস্থা করেছিলাম। আমার বাড়ীতেই হয়েছিল সেই সাক্ষাৎ। ববের কথা বরুণ সব জানত। আমার কাছ থেকেই সব শুনেছিল বরুণ। সব কথা যখন আমার কাছ থেকে শুনেছে বরুণের মুখের একটা রেখারও কোনো পরিবর্তন হয়নি। অনেকক্ষণ বসে থেকেছে বব্ আর বরুণ, হেসেছে, কথা বলেছে, ড্রিংক কবেছে। কোনো রাগ, কোনো ঈর্ষা, কোনো ভুল বোঝাবুঝির দেওয়াল তাদের মধ্যে ছিল না। মধ্যে থেকে আমিই একটা মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছিলাম। ওদের আলোচনার মধ্যে হঠাৎ ছন্দ পতন করে বলেছিলাম, "জানো বরুণ, বব্ খুব সুন্দর বেহালা বাজায়।"

"তাই বুঝি"—বরুণ লাফিয়ে উঠেছিল। বরুণের সংগীত-প্রীতি আমি জানতাম।

বব্‌কে আগ্রহ করে অনুরোধ করেছিলাম বেহালা বাজাতে "কাম অন বব্‌।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে ববের মুখের চেহারাটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। গালের কোঁচকানো চামড়াগুলো হঠাৎ ফুলে উঠেছিল। চোখদুটো জলে ভরে গিয়েছিল। সারা শরীরটা হঠাৎ বেঁকে গিয়েছিল। নিজের কাটা হাতটার দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল। রাগে দুঃখে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছিল, "আই ডোণ্ট প্লে দি ভায়োলিন এনী মোর।" বলেই হঠাৎই ঘর থেকে ছুটে বাইরে চলে গিয়েছিল। কেন যে সেদিন এত বড় ভুল আমার হয়েছিল তা আজও বুঝতে পারি নি। ববের ভায়োলিন তো সেদিনই সে টাইম-কীপার রতনবাবুর হাত দিয়ে নীতাদির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া সে তো আর বেহালা বাজাতে কখনও পারবে না।

বরুণ ব্যাপারটা খানিকক্ষণ পরে বুঝতে পারে।

"এ কি করলি তুই? লোকটার মনে এমনভাবে কষ্ট দিলি?"

"কি জানি কেন এরকম ভুল আমার হোলো। আমার মনেই ছিল না যে বব্‌ আর কোনোদিন বেহালা বাজাতে পারবে না। তার হাতটাই যে কাটা গিয়েছে। ছি ছি ছি।"

"যাক যা হবার হয়ে গিয়েছে। ও নিশ্চয় বুঝবে যে

তুই ইচ্ছে করে ওর মনে কষ্ট দিস নি ” আমায় সান্ত্বনা দিয়েছিল বরুণ।

“না না, ও বোধহয় কোনোদিন ক্ষমা করবে না আমায়” বলেছিলাম অনুশোচনায়।

“তোর ভুল। লোকটা অনেক মহৎ, অনেক বড় তোর আমার চেয়ে।’

অনেকক্ষণ তারপর আমি আর বরুণ ঘরের মধ্যে বসে কথা বলেছি। আজও মনে পড়ে সেই সন্ধ্যার কথা। বরুণ বসেছিল পিয়ানোটার কাছে, হাতে হুইস্কীর গ্লাস। কথার মাঝে মাঝে পিয়ানোটায় টুং-টাং করে ভাঙা ভাঙা সুর তুলেছে। আবার মাঝে মাঝে বিরাট জোরে হেসে উঠেছে। কথাটা আমিই পেড়েছিলাম। “আচ্ছা বরুণ, একটা কথা বলব ?”

“কি বল্ না। এত কিন্তু কিন্তু কেন ?”

“কিছু মনে করবে না তো ?”

“পাগল। যা বলবার বল। আমি এবার বেরোবো।”

“নিউমার্কেটে অর্কিড কিনতে তো।”

“যেখানে যাই না কেন তোর কি দরকার ? যা বলবার বল।”

“আচ্ছা। তোমার আর নীতাদির মধ্যে এই ভুল বোঝাবুঝিটা কী কোনদিন শেষ হবে না ?”

“ভুল বোঝাবুঝি। কোথায় ভুল বোঝাবুঝি ? অম্লান বদনে বলল বরুণ।”

“ভুল বোঝাবুঝি নেই ?”

"মোটেই না।"

"তাহলে তুমি হঠাৎ বিলেত চলে গেলে। সেখান থেকে কয়েকটা আজে-বাজে চিঠি লিখে নীতাদির মনে কষ্ট দিলে। যখন ফিরে এলে নীতাদিকে এয়ারপোর্টে না দেখে, তুমি মুখে না বললেও, আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, মনে কষ্ট পেয়েছিলে। আর তোমার আসার আগে নীতাদি হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চলে গেল।"

"সব ভুল। সব ভুল।" বরুণ কথাটা বলে খানিকক্ষণ চুপচাপ হয়ে গেল। পিয়ানোটায় আঙুল বুলিয়ে আবার টুং-টাং ভাঙা ভাঙা সুরের তরঙ্গ তুলেছে। বোতল থেকে ঢেলেছে হুইস্কী। আমার খুব কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বলেছে, "ত্থাখ, একটা কথা তোকে বলি। নীতাকে আমি আজও ভালবাসি। চিরকালই ভালবাসব। আর আমার মনে হয় সেও আমাকে ভালবাসে আর ভালবাসবে চিরকাল। আমাদের ভালবাসার গতানুগতিক রুটিন মাফিক পরিণতি হয়তো হয়নি, তাই বলে কি আমাদের ভালবাসাটাই মিথ্যে হয়ে যাবে। পৃথিবীর সব ভালবাসারই একটা পরিণতি, একটা শেষ আছে। থাক না একটা ভালবাসা যার কোনো পরিণতি বা শেষ নেই।"

"এসব কথা এখন বলা খুব সহজ বরুণ। আজ তোমার ভালবাসার কি মূল্য বল। নীতাদির জীবনেরই বা কি মূল্য আছে বল। আর সত্যি কথা বলতে কি নীতাদির যা এখন অবস্থা তাতে তোমার কাছেই বা তার মূল্য কতটুকু। তোমার

এই পরিণতিহীন ভালবাসার কথা শুনতে আগে হয়তো ভালো লাগত। কিন্তু এখন নেহাতই ফাঁকা বুলির মতো মনে হচ্ছে বরুণ।"

"হয়তো হচ্ছে। আসল ব্যাপারটা কি জানিস্। তুই আমাকে খুব ছোটো করে দেখছিস। আমি অত ছোটো নাবে যতটা তুই ভেবেছিস। নীতার মতকে আমি সম্মান করেছি। সে কবেছে সম্মান আমাব মতকে, আমার আদর্শকে। হয়তো কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি তুই দিক্ থেকেই হয়েছে, কিন্তু সে নেহাতই ভুল বোঝাবুঝি। নীতাব মূল্য আজ আমার কাছে অনেক বেশী। আজ নীতাব প্রয়োজন একটা অবলম্বন, একটা সাহায্য, একটা সাপোর্ট। আমি, আমি দেব সেই অবলম্বন, সেই সাপোর্ট। যখন সবাই তাব কাছ থেকে দূরে সরে যাবে, আমি দাঁড়াবো তার পাশে। দেখি কি করে নীতা আমায় দূরে সবিয়ে দেয়?" আবেগহীন গলায় বরুণ কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে গেল।

"তাহলে চোরেব মতো করছ কেন? সাহস করে সামনে গিয়ে দাঁডাচ্ছ না কেন? বাজার থেকে রোজ কিনে আনো অর্কিডের বোকে। তা তোমার গাড়ীতেই শুকিয়েই মরে যায়। কেন গিয়ে দাঁড়াচ্ছ না নীতাদির পাশে। কেন বলছ.না তাকে যে তুমি এসেছ।"

"মাঝে মাঝে ইচ্ছে তাই 'হয় কিন্তু কি জানিস্ নিজের ওপর কেমন যেন ভরসা হয় না। মনে হচ্ছে আমি আর বেশীদিন বাঁচব না। মনে কর নীতার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমি জানি নীতা দু হাত বাড়িয়ে আমায় স্বীকার করবে নীতা হয়তো আমাকে অবলম্বন, আমাকে সাপোর্ট করেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাইবে। এর চেয়ে বেশী সুখের কথা আমি ভাবতে পারি না। কিন্তু ধর তারপরই আমার যদি কিছু হয়, তখন নীতার কি হবে ভাবতে পারিস? তখন কোথায় দাঁড়াবে নীতা? নিজের ভাগ্যকে সে এখন মেনে নিয়েছে আর তাই নিয়েই বেঁচে আছে। আমি দাঁড়ালাম তার পাশে•হঠাৎ-পাওয়া-আলোর মতো। কিন্তু সেই আলোই যদি আবার হঠাৎই নিভে যায় তখন কি হবে নীতার ভাবতে পারিস। তাই মাঝে মাঝে ভয় হয়, এগিয়ে যাই, আবার পেছিয়ে আসি।"

বরুণের কথার জবাব অনেকক্ষণ দিতে পারিনি। হয়তো বরুণ ঠিকই বলছে, হয়তো তার সমস্ত ধারণাই ভুল। কিন্তু এইরকম দোটানার মধ্যে থেকে তারও জীবনটা হয়ে উঠবে দুর্বিষহ। বললাম,—"না বরুণ। তোমাকে দাঁড়াতেই হবে নীতাদির পাশে। আজ যে তার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই।"

"তুই বলছিস। ঠিক আছে তাই হবে তা'হলে।"

বরুণ গাড়ী বের করে চলে গেল নিউমার্কেটের দিকে।

আট

যখন ববের কোলিয়ারীর কাছে এসে পৌঁছেছি তখন সন্ধ্যা হয় হয়। একটা লাল আভা সারা আকাশময় ছড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত আকাশটার গায়ে কে যেন সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। দূর থেকে ভেসে আসছিল কান ফাটানো চিৎকার আর কোলাহল। কাছে আসতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা বর্ণনা করা যায় না। পুলিস, অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার-ব্রিগেড, চিৎকার, কান্নাকাটি, হৈচৈ সে এক অদ্ভুত পরিবেশ। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

নীতাদি জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে রে?"

"কিছুই তো বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার।"

ভিড় ঠেলে আমি আর নীতাদি যখন কাছে পৌঁছেছি তখন কাউকে আব কিছু জিজ্ঞেস করতে হয়নি। কোলিয়ারীতে আগুন লেগেছে। খাদের নীচে তখনও অনেক লোক। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সেই কান্না আকাশে-বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুবার বিস্ফোরণেব বিকট আওয়াজ শুনতে পেলাম। পাশেই কোম্পানির বড় কর্তাদের আলাপ-আলোচনা শুনতে পেলাম: "জল পাম্প করে সীল করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই।"

"কিন্তু নীচে যে অনেক লোক, তাদের যে জীবন্ত সমাধি হবে"—আরেকজন কেউ প্রতিবাদ জানায়।

"তাছাড়া আর উপায় কি। তাদের বাঁচানো অসম্ভব।

তারা হয় আগুনে পুড়ে মরবে, কিংবা এক্সপ্লোসন-এ মারা যাবে। তাদের বাঁচানোর কোনো উপায়ই নেই। জল পাম্প করে সীল না করলে সমস্ত কোলিয়ারীটাই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।"

কে যেন পাশে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ বলে উঠল: "কোনো মানে হয় এরকম করার। লোকটা একেবারে বদ্ধ পাগল। কারুর কথা শুনল না। হুট্ করে নেমে পড়ল খাদের মধ্যে।"

"কে নেমে পড়ল খাদের মধ্যে?" জিজ্ঞেস করলাম লোকটাকে।

"কে আবার। ঐ যে নতুন সাহেব এসেছে। কি নাম যেন---বব্ স্লেটর।"

লোকটার কথা তখন বোধহয় শেষও হয়নি। এক মুহূর্তের মধ্যে নীতাদি তীবের মতো আমার সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেল। "নীতাদি, নীতাদি" বলে চিৎকার করে উঠলাম। ঘড়ঘড় শব্দ করে একটা 'কেজ' উঠে এল।

"নীতাদি দাঁড়াও, পাগলামী করো না", উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি তখন নীতাদিকে ধরতে।

দূর থেকে ভেসে এল নীতাদির কণ্ঠস্বর: "না না, তুই আমায় বাধা দিস্ না। আমার কিছু হবে না। আমি যে ডাক্তার। আমার কি এই সময় চুপ করে থাকা উচিত। যদি ববের কিছু হয়।" আর কিছু শুনতে পেলাম না। কেউ কিছু বলার আগেই নীতাদি—লাফ দিয়ে কেজের মধ্যে

ঢুকে পড়ল। পরমুহূর্তেই কেজটা নেমে গেল খাদের মধ্যে।

বিরাট জোরে একটা বিস্ফোরণ হোলো। পাগলের মতো দৌড়ে গিয়েছি খাদের মুখে। দুটো শক্ত হাত আমার পেছন থেকে জাপটে ধরেছে। চারিদিকে আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে। খানিকক্ষণ পরে একরাশ স্ট্রেচার নেমেছে নীচে আর পর পর উঠে এসেছে অনেকগুলো দেহ। চাদর দিয়ে ঢাকা, এক একটা মাংসের স্তূপ। দাঁড়াতে পারিনি সেখানে। হঠাৎ মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠেছিল। তারপরে আর কিছুই মনে নেই।

তারও অনেক পরে হাসপাতালে গিয়েছিলাম, আর সেখানে গিয়ে যা দেখেছিলাম তা ভাবতে আজও আমার গা শিউরে ওঠে। প্রথমেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ববের বেডের কাছে। মুখের ওপর ঢাকা দেওয়া চাদরটা সরাতেই আমি যেন আঁতকে উঠেছিলাম। এই কি সেই সুন্দর সুপুরুষ বব্ স্লেটর। মুখটা পুড়ে ঝল্‌সে গিয়েছে। বাঁ পা আর ডান হাতটা উড়ে গিয়েছে। সে এক ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য। ভয়ে নিজের চোখ ঢেকে নিয়েছিলাম আর মুখ থেকে বেরিয়েছিল একটা অস্ফুট আর্তনাদ। বব্ যে কি করে বেঁচে গেল ডাক্তাররা তাই ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছিল। কে যেন বললে, "এ লাকি ম্যান।" আমার যেন মনে হোলো ববের চেয়ে হতভাগ্য এ পৃথিবীতে কেউ ছিল না। এত লোক মরল আর বব্ মর্‌তে পার্‌ল না? কেন সে বেঁচে

রইল? কি করে সারা জীবন সে এই অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকবে? এই বীভৎস চেহারা নিয়ে কি করে সে সভ্য সমাজের সামনে দাঁড়াবে। আর সবাইকার সঙ্গে বব্‌ও যদি সেদিন মরতো তাহলে আমি হয়তো খুশীই হতাম। বব্‌ তখনও কিছুই জানে না তার কি হয়েছে। যখন সে জ্ঞান ফিরে পাবে, যখন সে তার নিজের মুখটা দেখ্‌তে পাবে তখন তার নিজেরই কি আব বাঁচার কোনো ইচ্ছে থাক্‌বে?

আর নীতাদি। যদি বব্‌ আর নীতাদিও সেদিন আর সবাইকার মতো শেষ হয়ে যেতো তাহলে হয়তো আমার এত কথা বলতে হোতো না, আর সে সব কথা ভেবে দুঃখ পেতেও হোতো না। নীতাদি, বব্‌ আর বরুণের মধ্যে আমি বোধ হয় ছিলাম এক অদৃশ্য যোগাযোগের নিমিত্ত।

নীতাদি সেদিন খাদের মধ্যে বেশীদূর নামতে পারেন নি। 'কেজ'টা নীচে নামবার আগেই হয়েছিল সেই বিস্ফোরণ। নীতাদির বেশী কিছু হয় নি। শুধু চোখ দুটো গিয়েছে। ভাবতেও কেমন লাগে। সেই সুন্দর ভাসা ভাসা চোখ দুটো আর নেই। মাইন্‌সের কর্তারা বললেন বব্‌কে চিকিৎসার পর তারাই কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন। কলকাতায় আমার ঠিকানা তাদের কাছে রেখে এলাম।

কয়েকদিন পরে নাগপুর স্টেশনে যখন নীতাদিকে স্ট্রেচারে করে ট্রেনে তুললাম, তখনও নীতাদি ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে নি। চোখের ওপর পুরু করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

ট্রেনটা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল প্ল্যাটফর্মের

ওপর। চুপচাপ এককোণে দাঁড়িয়ে টাইম-কীপার রতনবাবু। "রতনবাবু, রতনবাবু" চিৎকার করে ডাকলাম।

বিভ্রান্তের মতো রতনবাবু এগিয়ে এলেন। "কি চললেন স্যার?" শুকনো তিনটে কথা।

"আপনি আবার স্টেশনে কেন? আপনি কোথায় চললেন?"

"আমি। আমিও চললাম স্যার। সবই শুনেছি স্যার, সবই জেনেছি। ভেবে দেখলাম—টাইম-কীপারেরও টাইম হয়ে এসেছে। এবার চলে যাওয়াই ভালো।"

"তা কোথায় যাবেন?"

"কোথায় যাবো। তাতো ঠিক জানি না। যাব যেদিকে দু-চোখ যায়। যখন ছোট বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসি, তখন কি ঠিক করেছিলাম এই জানোয়ারদের দেশে এখানে আসবো। আজ যখন চলে যাচ্ছি তখনও কোনো ঠিক নেই কোথায় যাবো।"

ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে। কামরার পাশে চলতে চলতে রতনবাবু বললেন, "ডাক্তারদিদি যখন ভালো হয়ে যাবে তখন বলবেন টাইম-কীপার রতনবাবুর কথা আর আমার প্রণাম জানিয়ে দেবেন।" রতনবাবু ময়লা জামার আস্তিনে চোখের জল মুছলেন।

কলকাতা পৌঁছুবার দু-তিনদিন পরেই নীতাদি একটু সুস্থ হয়েছিল। তখন অনেকটা স্বাভাবিক। আমি তখন পাশেই। জীবনে অনেক কিছুই দেখেছি, অনেক কিছুই

শুনেছি। দুঃখে শোকে ব্যথায় যন্ত্রণায় মানুষকে অভিভূত হতে অনেকবার দেখেছি, কিন্তু এরকম কখনো কোনোদিন দেখিনি। নিজের যন্ত্রণা নিজের দুঃখ নিজের ব্যথা নিজের শোককে এমনি নির্বিকারভাবে মেনে নিতে আর কখনও কাউকে দেখিনি আমি।

আস্তে আস্তে নীতাদির ঠোঁটের কোণে মৃদু একটা হাসি ভেসে এসেছিল, তারপরেই নিজের হাতটা চোখের ব্যাণ্ডেজটার উপর বুলিয়ে নিয়ে একহাত দিয়ে আমার হাতটা খুঁজে খুঁজে চেপে ধরেছিল। খুব ধীরে বলেছিল "তুই না?"

বলেছিলাম, "হ্যাঁ নীতাদি, আমি।"

"আমি জানতাম তুইই থাকবি আমার কাছে। আর কেউ তো আর থাকবে না।" মুখটা একটু করুণ করে নীতাদি বলল।

"থাক না ওসব কথা।"

"হ্যাঁ তাই ভালো, ওসব কথা থাক। কি আর হবে ওসব ভেবে।

মাঝ থেকে চোখ দুটোই গেল।" নির্বিকারভাবে বললে নীতাদি।

"নীতাদি!"—নীতাদির এই খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলটা আমার কেমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল।

"না না, তুই ভাবছিস কেন। আমি তো ডাক্তার। আমি জানি চোখ দুটো আমার গিয়েছে। হঠাৎ চোখের সামনে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল। আমার

মনে আছে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। তারপরে আর কিছু মনে নেই।"

"ডাক্তাররা তো বলছিল তোমার চোখ ভালো হয়ে যেতে পারে।"

"যদি হয় ভালোই। না হলেও কোনো দুঃখ নেই। অনেক কিছুই তো দেখলাম। আর কিছু দেখার ইচ্ছে আমার নেই।" তাবপরেই আমাকে একেবারে কাছে টেনে নিয়েছিল নীতাদি। ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। বলেছিল, "শোন, বব্ কোথায় রে? ও কি··· ?" আর কিছু কথা বলতে পারে নি।

নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন মিথ্যা কথা বলেছিলাম। "না, বব্ ভালোই আছে, বেশী লাগে নি। কদিনের মধ্যেই সেরে উঠবে। শিগ্‌গিবই বোধহয় কলকাতায় ফিরে আসবে।"

"ওকে তুই আমাব কথা কিছু বলিস না। জানতে পারলে হয়তো কষ্ট পাবে। জিজ্ঞেস কবলে কিছু একটা বলে দিস।"

"ঠিক আছে তাই হবে।"

এর কিছুদিন পরেই হঠাৎ ধূমকেতুর মতো বরুণ কলকাতায় ফিবে এসেছে। সব বলেছি ওকে। কোনো কিছুই লুকোয় নি। জিজ্ঞেস করলাম, "দেখা করতে যাবে হাসপাতালে ?"

"না, থাক্। তুই কিছু বলিস না যেন ওকে আমার ফিরে আসার কথা।"

মনে হচ্ছিল এবার বোধহয় আমার মুক্তি হবে।

নীতাদিও মানা করেছে বব্‌কে কিছু বলতে। আর বরুণও মানা করেছে নীতাদিকে কিছু বলতে। ব্যাস তাহলে তো আমার ছুটি।

মাইন্‌সের হাসপাতাল থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে বব্‌কে আনতে স্টেশনে গিয়েছিলাম। যে লোকটা কামরা থেকে নামলো সে যেন কোনো এক অজানা পুরী থেকে আসা এক প্রেতাত্মা। বাঁ পাটা হাঁটুর তলা থেকে বাদ দেওয়া। কোটের আস্তিনটা বাঁ হাতের কনুই-এর নীচে ঝুলছে। চোখের ওপরের পাতা কুঁচকে গিয়েছে। সারা মুখটা পুড়ে ঝলসে গিয়েছে। কালো কালো কোঁচকানো মাংস। ক্রাচে ভর দিয়ে খট্ খট্ খট্ করে কামরা থেকে নেমে বব্ বলেছিল, "হ্যালো দেয়ার।"

সেদিন বব্‌কেও মিথ্যা কথা বলেছিলাম। বব্ হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করে নি কিন্তু তবুও বলেছিলাম নীতাদির খোঁজ আমি জানি না।

"বাট্—ইজ্ শী অল্ রাইট।" বব্ জিজ্ঞেস করেছিল।

"ইয়েস।"

"দেন্ ইট্‌স্ অল্ রাইট।"

নীতাদির চোখের অপারেশন একদিন হয়ে গেল। ডাক্তাররা আশ্বাস দিলেন চোখ খুব সম্ভব ভালো হয়ে যাবে। নীতাদিকে যখন খবরটা দিলাম নীতাদির মুখে কোনো পরিবর্তনই দেখলাম না। সেই এক কথা। "ভালো হলেই ভালো। না হ'লেও দুঃখ নেই। কবে খুলবে বলতে পারিস?"

"দু'তিন দিনের মধ্যেই।"

শেষে সেই দিনও এসে গেল। নীতাদির চোখের ব্যাণ্ডেজ খোলা হবে। অনেক অজানা আশঙ্কা মনের মধ্যে ভিড় করে ছিল। যদি নীতাদির চোখ সত্যি ভালো হয়ে যায়! তারপব নীতাদি কি কববে। আবার কি ফিরে যাবে কালো সোনার খনির সেই হাসপাতালে। যদি নীতাদি দেখতে চায় বব্‌কে। আর যদি চোখ ঠিক না হয়। যদি নীতাদি আবার দৃষ্টি না ফিরে পায়। তাহলে। তাহলে কি কবে বাকী জীবনটা কাটাবে নীতাদি। সাবা জীবন কি নীতাদি অন্ধ হয়েই থাকবে?

সকালেই বলেছিল নীতাদি হঠাৎ কথাটা। ধীরে ধীবে বালিশেব ওপর ভর দিয়ে। মুখটা আমার কানের কাছে এনে। নীতাদি ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল, "ওকে একবার খবব দিতে পারবি।"

বলেছিলাম, "চেষ্টা কবে দেখবো নীতাদি।"

এই আশঙ্কাই আমি কবছিলাম। চোখের দৃষ্টি যদি ফিরে পায় সেই আশাতেই নীতাদি বব্‌কে দেখতে চাইছে। কিন্তু ববের ঐ বীভৎস চেহারা দেখেই কি তার দৃষ্টিহীনতার অন্ত করবে। আর ভালো জিনিস দেখার কি কিছুই নেই পৃথিবীতে। কিছু বলতে পারি নি নীতাদিকে। শুধু বলেছিলাম, "আমি চেষ্টা করে দেখবো নীতাদি।"

"না না, চেষ্টা না, তুই যে করে পারিস একবার ওকে নিয়ে আয়। তোর অনেক আব্দার তো আমি রেখেছি।

আমার একটা কথা অন্তত রাখ”—হাঁপাতে হাঁপাতে নীতাদি মিনতি করেছিল।

“কি দরকার নীতাদি?”

“তুই বুঝবি না। কেন, তোকে বলিনি, ওকে আমায় বোঝাতে হবে। ও যে আমায় ভুল বুঝেছে। শুধু কয়েকটা কথা বলব। সে-রাতে সব কথা আমি ওকে বোঝাতে পারিনি। হয়তো ও বুঝতে পারে নি। তুই, লক্ষ্মীটি ওকে একবার নিয়ে আসিস আমার সামনে।”

নীতাদির কথা আমি রেখেছিলাম। ছুটে গিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বব্‌কে নিয়ে এসেছিলাম। বরুণকেও খবর দিয়েছিলাম। বরুণ তো সবই জানত। রোজই হাসপাতালের সামনে অর্কিডের বোকে নিয়ে গাড়ীতে বসে থাকত। বরুণও এসেছিল হাসপাতালের ভিতর অর্কিডের বোকে নিয়ে। এই বোধহয় প্রথম ও হাসপাতালের ভিতর এল বোকে নিয়ে।

বব্‌কে নিয়ে আমি যখন পৌঁছেছিলাম ততক্ষণে নীতাদিকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল বরুণ; মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ববের ক্রাচটা থেমে গিয়েছিল বরুণকে দেখে। শুকনো হেসে “হ্যালো” বলে আবার এগিয়ে গিয়েছিল বব্ খট্ খট্ খট্ করে। সবাইকার আগে চলেছে বব্ তার পেছনে আমি আর সব শেষে বরুণ।

টেবিলের ওপর শুয়ে আছে নীতাদি আর ডাক্তার ধীরে ধীরে চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলে দিচ্ছে। সবাইকার

চোখে মুখে একটা আশা আর আশঙ্কা মেশানো ভাব। যদি নীতাদি দৃষ্টি ফিবে না পায়। যদি সত্যিই দৃষ্টি ফিরে পায়? বব্ একবার আমার দিকে কঠিন দৃষ্টি দিয়ে চাইল। সেই চাউনির মধ্যে ছিল তিরস্কার আর অভিসম্পাত। সে যেন বলতে চাইছিল, "এতদিন তুমি আমায় মিথ্যে কথা বলে এসেছো। লজ্জা করে না তোমার" এয়ারপোর্টে যখন দেখা করেছি ববের সঙ্গে আর বলেছি নীতাদির সঙ্গে দেখা করতে তখন ফ্যালফ্যাল করে অনেকক্ষণ চেয়েছিল বব্ আমার দিকে। কোঁচকানো চোখটা আরো কুঁচকে উঠেছিল। মুখে একটা বিরক্তি আর যন্ত্রণার সুস্পষ্ট ভাব। বিরক্তিটা ছিল আমার ওপর। এতদিন তাকে আমি কেন বলিনি নীতাদি এখানেই আছে। আর যন্ত্রণা বোধহয় তার নিজের কথা ভেবে আর বিদায়ের শেষ মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী আনন্দের আতিশয্যে।

আমি আর একটা কথা ভাবছিলাম। বরুণ আমাকে তার এখানে থাকার কথা নীতাদিকে বলতে মানা করেছিল। আমি বরুণের কথা রেখেছিলাম। নীতাদিকে কিছুই বলিনি। কিন্তু চোখ খুলে যখন নীতাদি বরুণকে দেখতে পাবে তখন নীতাদি কি আমায় ক্ষমা করবে? বব্ আর বরুণ এক জায়গায়, এক সঙ্গে তার কাছে আসবে এ 'কথা নীতাদি হয়তো স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না। বরুণ তো তার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল আর নীতাদি নিজেও তো বরুণের কাছ থেকে আরো অনেক দূরে সরে

এসেছিল। কিন্তু নীতাদিই তো আমায় বলেছিল বরুণকে সে চিরকাল ভালবাসবে, আজও বাসে। বরুণও তো তাই বলেছিল আমায়। কিন্তু নীতাদি তো জানত না যে বব্ আর বরুণ নিজেদের কাছে কেউই অপরিচিত না। তারা সব জানে, সব বোঝে। হয়তো আমারই ভুল হয়েছে দুজনকে এখানে এনে। কিন্তু আমারও তো ঋণ শোধবার একটা সুযোগ দরকাব ছিল। নীতাদিব স্নেহ ভালবাসার ঋণ কতদিন আর বয়ে বেড়াতাম? এই তো আমার সুযোগ। বরুণ দিতে চেয়েছিল নীতাদিকে একটা অবলম্বন, একটা সাপোর্ট। আর আমি ভেবেছিলাম ভুল বোঝাবুঝির পালা শেষ হবার এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কখনও হয়তো দুজনের জীবনে আসবে না। বরুণ হয়তো আবার হবে নিরুদ্দেশ, অজানার পথে।

নীতাদির চোখের ব্যাণ্ডেজ খোলা হয়ে গিয়েছে। অধীর হয়ে বব্ এগিয়ে চলেছে টেবিলটার দিকে। অপারেশন থিয়েটাবের সেই শান্ত পরিবেশকে ছাপিয়ে উঠেছিল ববের ক্রাচেব শব্দ খট্ খট্ খট্।

নীতাদি উঠে বসেছে।

"ইয়েস ওপেন ইওর আইজ্ স্লোলী। হ্যাঁ, চোখ খুলুন আস্তে আস্তে।" ডাক্তার বললেন।

নীতাদি ধীরে ধীরে চোখ দুটো খুলল। ঘরের বিরাট ঘড়িটার টিক্ টিক্ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছিলাম ববের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ার শব্দ।

চোখের সামনে নিজের হাত দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে নিতাদি। বুঝতে পারছিলাম সব বোধহয় আবছা আবছা দেখছে নীতাদি। চোখটা আবার বন্ধ করল। আমার বুকটা তখন দুরুদুরু করে কাঁপছে। নীতাদি কি জীবনে কোনো দিন আমাকে ক্ষমা করবে? যখন দৃষ্টি ফিরে পেয়ে সে প্রথম বব্‌কে দেখবে তখন কি নীতাদি বুঝবে না তার সঙ্গে কি ঘৃণিত প্রতারণা আমি করেছি। কেন আমিই তো নীতাদিকে বলেছিলাম ববের বেশী কিছু হয় নি। সামান্যই লেগেছে। বব্‌কে নীতাদিকে দুজনকেই আমি মিথ্যে কথা বলেছি। তারা দুজনেই হয়তো কোনোদিন আমায় ক্ষমা করবে না। তারা হয়তো এও কোনোদিন জানবে না যে তাদের দুজনের কথা রাখতে গিয়েই আমি দুজনের কাছেই মিথ্যে বলেছি।

বরুণ ক্ষমা করলেও করতে পারে। তাকে আমি মিথ্যে বলিনি।

চোখের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নীতাদি আবার ধীরে ধীরে চোখ খুলল।

বব্‌ এগিয়ে চলেছে টেবিলটার দিকে। কাছে আরও কাছে—খট্‌ খট্‌ খট্‌।

হঠাৎ নীতাদি চোখ দুটো বড় বড় করে চাইল। মুখটার ওপর এক অপূর্ব রক্তিম আভা ভেসে উঠল। এক ঝিলিক হাসি খেলে গেল পাতলা ঠোঁট দুটোয়। আমার বুকটা কি যেন একটা অজনা আশঙ্কায় দুলে উঠল।

"বব্ আর ইউ হিয়ার?" নীতাদির কথা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

"ইয়েস নীতা, আই অ্যাম হিয়ার।" খট্ খট্ খট্ করে বব্ একেবারে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

"বব্ হোয়ার আর ইউ?"

"নীতা, আই অ্যাম সো ক্লোজ" বব ঝুঁকে পড়ল নীতাদির মুখের সামনে।

তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ অপারেশন থিয়েটারের বুক চিরে শোনা গেল। সে রকম আর্তনাদ আমি কখনও শুনি নি। আমি, বরুণ, ডাক্তার নার্স সব ছুটে গিয়েছি টেবিলের কাছে, কিন্তু ভয়ে সরে এসেছি।

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে নীতাদির দুই চোখ দিয়ে। দুই হাতে দুটো চক্চকে অপারেশনের ছুরি। সবাইকার অলক্ষ্যে পাশে রাখা ট্রে থেকে এক লহমায় উঠিয়ে নিয়েছে নীতাদি।

মুহূর্তের মধ্যে সারা হাসপাতালটা যেন পাগল হয়ে উঠেছিল। ডাক্তার নার্সদের ছোটাছুটি, টেলিফোন, পুলিস, গোলমাল, চেঁচামেচি সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য।

সে গোলমালের মধ্যেই শুনতে পেলাম খট্ খট্ খট্। বব্ করিডরের দিকে যাচ্ছে। জলভরা চোখে মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত করে আমার শার্টের কলার চেপে ধরে শুধু বলেছিল "ইউ ফুল।" আর বেশী কিছু সে বলতে পারে নি।

হাতে রাখা অর্কিডের বোকেটা ফেলে বরুণও এগিয়ে গেল

করিডরের দিকে। শুধু কয়েক মিনিটের জন্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল বব্ আর বরুণের। কোনো কটুতা, কোনো ঘৃণা, কোনো দ্বেষ ছিল না সেই দৃষ্টি বিনিময়ে। দুজনের চোখেই জল ভবে এসেছিল। ববের হাত যখন সে চেপে ধরে, বরুণ. যেন এইই বলতে চেয়েছিল "ওকে বব্ ইউ উইন, আই লুজ।"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওদের যাওয়াব দিকে তাকিয়েছিলাম, লম্বা করিডবের কঠিন ফ্লোবের ওপব অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল সেই দ্রুত খট্ খট্ খট্ শব্দ।

আমি যেন হঠাৎ পাথরের মতো হয়ে গেলাম। কি আমার কর্তব্য কি আমার করা উচিত, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

নীতাদি বলেছিল,"ভালো হলেই ভালো। না হলেও ক্ষতি নেই অনেক কিছুই তো দেখলাম। আর না দেখলেও চলবে।" চোখ নীতাদির ভালো হয়েছিল কিন্তু ভালো হয়ে নীতাদি যাকে সব চেয়ে বেশী দেখতে চেয়েছিল তাকে দেখে তার আর দৃষ্টি ফিরে পাবার কোনো মোহই ছিল না। আবার দৃষ্টিহীন হতে চেয়েছিল নীতাদি। তার কাছে দৃষ্টি ফিবে পাওয়া হয়েছিল নিবর্থক। আমি ভাবতাম নীতাদি হয়তো স্যাডিস্ট, যে অন্যকে দুঃখ দিয়েই আনন্দ পায় কিন্তু কই তা তো নয়। নীতাদি তো প্রমাণ করে দিল যে সে চরম "ম্যাসোচিস্ট," যে নিজেকে কষ্ট দিতে ভালবাসে।

নীতাদি জানতেও পারলে না যে সেদিন বরুণ এসেছিল।

তার পরের কদিন গিয়েছে একটা দুঃস্বপ্নের মতো।

পুলিসের হাঙ্গামা, নীতাদির চিকিৎসা, এনকোয়ারী অনেক ঝামেলাই আমাকে সইতে হয়েছে। আমাকে যেতে হয়েছে কাজের তাগিদে কলকাতার বাইরে। কয়েকমাস পরে যখন ফিরে এসেছি তখন নীতাদির আর কোনো খোঁজই পাই নি। হাসপাতাল থেকে কাউকে না বলেই চলে গিয়েছে কোথাও।

একদিন হঠাৎই সুদূর সিমলা থেকে বরুণের চিঠি এসেছে আর সব পুরনো কথা আমার মনে হয়েছে। মাঝে মাঝে চিঠি দিত বরুণ কিন্তু সেদিনের চিঠিতেই প্রথম লিখেছিল নীতাদির কথা। নিজেই লিখেছিল, "আর বেশীদিন হয়তো বাঁচব না।" তাই বোধহয় স্বীকারোক্তি করে যেতে চাইছিল।

"জানিস্" বরুণ লিখেছিল। "তুই তো আমাকে সবই বলেছিলি। প্রতিদিন হাসপাতালে গিয়েছি অর্কিডের বোকে নিয়ে। রোজই ভেবেছি নীতার কাছে যাব আর বলব "নীতা, আমি ফিরে এসেছি। চোখে যদি দেখতে না পার, মনের আয়নায় দেখ আমি এসেছি। সেদিন তাই বলতেই গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সবাইকার শেষে গিয়ে দাঁড়াব নীতার কাছে। যখন কেউ থাকবে না তখন আমি যাব কাছে। আমি ভাবতেও পারিনি নীতা চোখের দৃষ্টি ফিরে পাবে। কিন্তু সেদিন বলতে আর আমি পারলাম না। বলা আমার হোলো না। আজ তার জন্যে দুঃখ পাচ্ছি, যন্ত্রণা পাচ্ছি আর সেই অনুচ্চারিত ব্যথার যন্ত্রণায় জর্জরিত হচ্ছি। তবু বেশ লাগছে এই ভাবতে যে আর বেশীদিন

নেই। একটা কথা বলব? জানিস, বাঁচতে মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো জীবনটা আবার শুরু করতেও পারি। জীবনেব সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছি তবুও সারারাত তো বাকী আছে। কিন্তু যার জন্যে জীবনটা শুরু করতে চাই সেই তো হারিয়ে গেল। সে আছে কি না জানি না কোথায় আছে তাও জানি না। যদি কখনও খোঁজ পাস, আর যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে একটা খবর দিস্।"

বরুণের চিঠি নিয়ে সেদিন বসেছিলাম। অনেক কথাই মনে পড়েছিল সেদিন। বরুণ নীতাদিকে বলতে চেয়েছিল, বলতে পাবে নি। নীতাদি বব্‌কে বলতে চেয়েছিল, বলতে পারে নি। বব্‌ও হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বলতে পারে নি।

আর আমি। আমি কাকে কি বলব? আমার যে কত ব্যথা তা কাকে বোঝাব? নীতাদি, বব, বরুণ, রতনবাবু বাবুরাও সবাইকারই দুঃখ ছিল, ব্যথা ছিল। তাদের সুখ দুঃখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তাদেব সবাইকার ব্যথাই আমি অনুভব করেছি। হয়তো তাদের ব্যথা বহন করেই আমি আবো বেশী ব্যথা পাচ্ছি। সেদিন বরুণের চিঠি পড়তে পড়তে কে যে "স্যাডিস্ট" আর কে যে "ম্যাসোচিস্ট" তার হিসেবই আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

নয়

নীতাদির কোয়ার্টারের ছোটো বারান্দায় বসে সেদিন সেই হাসপাতালের দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তারপরই ছবির মতো সব ভেসে উঠেছিল স্মৃতির মানসপটে। এতদিন পরেও সব মনে পড়েছিল আমার। কিছুই ভুলে যাইনি।

চাকর চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে হঠাৎ নীতাদি জিজ্ঞেস করেছিল, "শোন্, একটা কথা বলবি ?"

"বল।"

"সেদিন হাসপাতালে কি বরুণ এসেছিল। আবছা আবছা যেন দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। হয়তো ভুলও হতে পারে।"

"বরুণ" হঠাৎ বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। "হ্যাঁ এসেছিল" বলেই তাড়াতাড়ি নীতাদিকে বলেছিলাম, "নীতাদি, আমি একটা ফোন করে আসছি।"

পাশের ঘরেই ফোন রাখা ছিল। কি জানি হঠাৎ বরুণের বাড়ীতে ফোন করলাম। জানতাম বরুণ হয়তো কলকাতাতে নেই কিন্তু আমায় আশ্চর্য হতে হয়েছিল বরুণের গলা শুনে।

রিসিভারটার মুখটা হাত দিয়ে চেপে খুব ধীরে ধীরে বলেছিলাম, "তুমি বলেছিলে না, খোঁজ পেলে তোমায় খবর দিতে।"

বরুণের শান্ত গলার জবাব পেলাম, "খোঁজ পেয়েছিস ? এত যুগ পরে। কোথায় ?"

ঠিকানাটা বরুণকে বলে ফোনটা রেখে দিলাম। আরেকটা ফোন করলাম টমলিনসন সাহেবকে। বললাম, "ব্লাইণ্ড স্কুল নিয়ে লেখা আমার দ্বারা হবে না। আমায় যেন ক্ষমা করা হয়

বুঝতে পারলাম সাহেব রাগের চোটে দুম করে টেলিফোনটা রেখে দিলেন।

আবার বারান্দায় এসে বসলাম। বেশীক্ষণ বসতে হয়নি। খানিক পরেই উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ী চালিয়ে এসেছে বরুণ।

"কে এল রে গাড়ী করে ?" নীতাদি জিজ্ঞেস করল।

"বুঝতে পারছি না।"

গাড়ী থেকে বরুণ নামল। সব চুলগুলো পেকে গিয়েছে। মুখে সেই মৃদু হাসি। ঠোঁটের কোণে চেপে রয়েছে পাইপ। হাতে অর্কিডের থোকে।

বরুণ তখন বারান্দার দিকে উঠে আসছে আর আমি নামছি বারান্দা থেকে।

"কে এল রে ? বল না। জবাব দিচ্ছিস না কেন ? কে এল ?" নীতাদি প্রায় চীৎকার করে উঠল।

"নীতা। আমি, এসেছি নীতা"—বরুণের গলা শুনতে পেলাম।

"কে ?" নীতাদির বোধহয় মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। ঝনঝনাৎ করে চায়ের কাপটা পড়ে গেল।

"নীতা আমি বরুণ।"

"না না বরুণ, তুমি ফিবে যাও। অনেক দেবি হয়ে গিয়েছে বরুণ।"

"দেবি হয়নি নীতা। ফিবে যেতে তো আমি আসি নি। আমাব বুকে যে কত ব্যথা তা কি তুমি জানো না।"

আমি তখন বাস্তায় নেমে পড়েছি। দূব থেকে দেখলাম বরুণেব বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নীতাদি।

"When we had passed the gate
I pulled my hat down over my eyes
And wept a little and no one Saw it"—

—Silvio Pellico